এসো ঈমান শিখি

মুফতী মনসূরুল হক

www.darsemansoor.com

সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
অধ্যায়-এক : সহীহ্ ঈমানের কষ্টিপাথর	৭-৪৫
আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ঈমান	১০
ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান	১৮
আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান	১৯
নবী-রাসূল (আঃ) এর ওপর ঈমান	২০
কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান	২৪
তাকদীরের ওপর ঈমান	২৬
মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান	২৭
মুসলমানদের আরো কতিপয় আক্বীদা বিশ্বাস	৩০
অধ্যায় দুই : ঈমানের সাতাত্তর শাখা	৪৬-৬৫
ঈমান সংশ্লিষ্ট ৩০ টি কাজ-যা দিলের দ্বারা সমাধা হয়	৪৬
ঈমান সংশ্লিষ্ট ৭টি কাজ-যা জবানের দ্বারা সমাধা হয়	৫৩
ঈমান সংশ্লিষ্ট ৪০টি কাজ-যা বাহ্যিক	৫৬
ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৬ টি কাজ-যা নিজে নিজেই করতে	৫৬

www.darsemansoor.com

হয়	
ঈমান সংশ্লিষ্ট ৬টি কাজ-যা আপনজনের সাথে সম্পৃক্ত	৫৮
ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৮টি কাজ-যা অন্য লোকদের সাথে সম্পৃক্ত	৬১

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর, আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে সমগ্র বিশ্ব জগতকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইবাদত করা। এই ইবাদত তথা সহীহ ঈমান ও নেক আমলের মধ্যেই মানুষের শান্তি ও কল্যাণ নিহিত। আর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতিতে বেইজ্জতি, ধ্বংস ও জাহান্নাম অনিবার্য। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্নে আল্লাহ তা‘আলা নিজ পরিচয় ও কুদরতের বর্ণনা দিয়ে তাদের থেকে নিজের প্রভুত্বের স্বীকারোক্তিমূলক অঙ্গীকার নেয়ার পর দুনিয়াতে তা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী, রাসূল ও পয়গাম্বরআ.। সকল পয়গাম্বরের মৌলিক শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর প্রতি ও হাশর-নাশরের প্রতি ঈমান এবং নেক আমল ইত্যাদি বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছেন।

ঈমান ও আমল উভয়টা মানুষের ইখতিয়ারভূক্ত বিষয়। সুতরাং, মেহনত-মুজাহাদা ও কষ্ট-সাধনার মাধ্যমে উক্ত মহামূল্যবান দু’টি বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে লাভ করা এবং তা খুব মজবুত ও দৃঢ় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য।

উল্লেখ্য যে, আমলের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, শুধু সহীহ ঈমান দ্বারাও জান্নাত লাভ হবে (যদিও তা প্রথম অবস্থায় না হোক), কিন্তু সহীহ ঈমান ব্যতীত হাজারো আমল একেবারেই মূল্যহীন। যথার্থ ঈমান ব্যতীত শুধু আমল দ্বারা নাজাত পাওয়ার কোন সুরত নেই।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে চরম ফিতনার যুগে অনেক মানুষ সকালে মু‘মিন থাকলেও বিকালে ঈমানহারা হচ্ছে, আবার কেউ বিকালে মু‘মিন থাকলেও সকালে নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু মানুষের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণের জন্য যথার্থ ব্যবস্থা সমাজে নেই। অথচ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার দরুন এতদসম্পর্কিত অধিক

সংখ্যক কিতাবপত্র রচনা ও আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত থাকা ছিল একান্ত জরুরী।

এতদুদ্দেশ্যে আমি নালায়েক 'আকীদাতুত তাহাবী, শরহে আক্বায়িদ, তা'লীমুদ্দীন, ফুরূউল ঈমান'সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে সহীহ আকীদাসমূহ পেশ করতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। যাতে করে সাধারণ মানুষের বুনিয়াদী ঈমান-আক্বীদা সহীহ হয়ে যায়। পাশাপাশি তা পরিপূর্ণ ও মজবুত করার জন্য ঈমানের শাখাগুলোর বিবরণ পেশ করেছি। আর ঈমান হিফাযতের জন্য ভ্রান্ত আক্বীদা, কুফরী ও শিরকী কথা এবং ভুল রাজনৈতিক দর্শনের বর্ণনা দিয়েছি। যেন কেউ কুফরী আক্বীদা পোষণ করে নিজের ঈমান ধ্বংস করে না ফেলে। আর ৪র্থ অধ্যায়ের শেষাংশে গুনাহে কবীরার বিবরণ এজন্য পেশ করা হয়েছে, যাতে করে এগুলোকে মানুষ গুনাহ এবং আল্লাহর নাফরমানী বলে বিশ্বাস করে নিজেকে এসব কাজ থেকে দূরে রাখে। গুনাহে কবীরাকে হালাল বা জায়িয মনে করলে মানুষ ঈমানহারা হয়ে যেতে পারে। এজন্য গুনাহের ইলম

থাকা ঈমানের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ বিষয়াদি মিলে বইটি রুগ্ন মুসলিম জাতির রোগ নিরাময়ের জন্যে বিশেষ কার্যকর হবে বলে আল্লাহর দরবারে আশা করি। আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ করি, তিনি যেন এ কিতাবটি কবুল করেন এবং এটাকে মুসলিম মিল্লাতের হিদায়াতের জারি‘আ করেন। আমীন।

বিনীত
মনসূরুল হক
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

باسمه تعالي

অধ্যায় এক

সহীহ ঈমানের কষ্টিপাথর

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

তরজমা: রাসূল ঈমান আনয়ন করেছেন ঐ সকল বস্তু সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর নবীগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর নবীগণের মাঝে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা আরো বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই, ওহে আমাদের পালনকর্তা!

আমরা সকলেই আপনারা দিকে প্রত্যাবর্তন করি। [সূত্র : সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৫।]

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর ও কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে"। [সূত্র: সূরা নিসা, আয়াত ১৩৬।

হাদীসে জিবরাঈলে উল্লেখ আছে, হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ছদ্মবেশে এসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কাকে বলে? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : اَنْ تُؤ مِنَ بِا للّهِ وَمَلٰئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه والْيَؤمِ الاَخِرِ وَتُؤْمِنُ بِا لْقَدْرِ خَيْرِه وَ شَرِّه

ঈমানের হাকীকত হলো, তুমি মনে-প্রাণে বদ্ধমূলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ তা‘আলার ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, আসমানী কিতাবসমূহের ওপর, আল্লাহ তা‘আলার নবী-রাসূলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের ওপর এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হওয়ার ওপর। [সূত্র: বুখারী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২ ও মুসলিম। মিশকাত শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১]

উল্লেখিত আয়াত ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এ হাদীসটি ‘ঈমানে মুফাসসাল’-এর ভিত্তি। ঈমানে মুফাসসালের মাধ্যমে এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি জানানো হয় এবং মনে-প্রাণে বদ্ধমূল বিশ্বাসের ঘোষণা করা হয় যে,

أَ مَنْتُ بِا للهِ وَ مَلأَئِكَتِه وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِه وَالْيَوْ مِ الأخِرِ
وَالقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ ا للهِ تَعَالي والْبَعْثِ بَعْدَا لْمَوْتِ

আমি ঈমান আনলাম বা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করলাম-১. আল্লাহ তা‘আলাকে, ২. তাঁর

www.darsemansoor.com

ফেরেশতাগণকে, ৩। তাঁর প্রেরিত সকল আসমানী কিতাবকে, ৪. তাঁর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলকে, ৫. কিয়ামত দিবসকে অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগত একদিন শেষ হবে, তাও বিশ্বাস করি, ৬। তাকদীরকে বিশ্বাস করি অর্থাৎ জগতে ভালো-মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট, তাঁরই পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন পুনর্বার জীবিত হতে হবে, তাও অটলভাবে বিশ্বাস করি।

উল্লেখিত ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৭নং বিষয় ৫নং বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রশাখা। তবে তার বিশেষ গুরুত্বের কারণে তাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো ঈমানের আরকান বা মূলভিত্তি । ঈমানের এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা সহকারে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা জরুরী। ঈমানের এ সকল বুনিয়াদী বিষয়গুলো সামনে ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা হবে।

ঈমানের সংজ্ঞা: আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত বিধান-আহকাম হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে তার কোন একটি বাদ না দিয়ে সব গুলোকে মনে প্রাণে বদ্ধমূল ভাবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তা‘আলার আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে এবং পূর্ণভাবে আমল করার মাধ্যমে এ ঈমান কামিল বা শক্তিশালী হয়।

আর আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনে ত্রুটি করলে ঈমান নাকেস বা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঈমানের নূর-নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে এবং তাওবা না করলে আল্লাহ না করুন ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কুফর এর সংজ্ঞা: আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি বিধান-আহকাম হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে তার কোন বিষয় সম্বন্ধে অন্তরে সন্দেহ পোষণ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ঠাট্টা মজা

করা। উল্লেখিত কাজের দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে তার পিছের জীবনের সকল ইবাদত-বন্দেগী ও আমল নষ্ট হয়ে যায়। এবং বিবাহিত হলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ না করুন এ অবস্থা কারো হলে তার জন্য জরুরী হল, নতুনভাবে কালেমা পড়ে তওবা ইস্তিগফার করে ঈমান দোহরায়ে নিয়ে বিবাহ দোহরায়ে নেয়া।

কুফর এর প্রকারভেদ: যদিও কুফরের বিভিন্ন প্রকার আছে তবে এর প্রত্যেকটি দ্বারা মানুষ ঈমান হারা হয়ে কাফির ও বেঈমান হয়ে যায়। সুতরাং এ সবগুলো বেঁচে থাকা ফরজ।

১। **কুফ্‌রে ইনকার:** অন্তর এবং যবান উভয়ের মাধ্যমে দ্বীনি বিষয় বা বিষয়সমূহ অস্বীকার করা। যেমন: মক্কার কাফিরগণ।

২। **কুফ্‌রে জুহুদ:** অন্তরে বিশ্বাস রাখা কিন্তু মুখে অস্বীকার করা। যেমন: মদীনার ইয়াহুদগণ।

৩। **কুফ্‌রে ‘ইনাদ:** অন্তরে দ্বীনকে বিশ্বাস করে এবং মুখেও স্বীকার করে। কিন্তু ইসলামের হুকুম

আহকাম কে মান্য করে না। অন্যান্য দ্বীন বাতিল হয়ে গিয়েছে তা বিশ্বাস করে না। যেমন: আদমশুমারীর অনেক নামধারী মুসলমান যারা কখনো সহীহ দ্বীনী পরিবেশে আসে না।

উল্লেখ্য, উল্লেখিত ৩টির যে কোন একটি পাওয়া গেলে তার ঈমান চলে যাবে।

৪। **কুফ্‌রে যানদাহকাহ:** বাহ্যিকভাবে দ্বীনের সব কিছু স্বীকার করে কোন বিষয়ে অস্বীকার করে না কিন্তু দ্বীনের কোন বিষয়ে এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যা উম্মতের ইজমা পরিপন্থী যেমন কাদিয়ানীগণ খতমে নবুওয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের ভণ্ড নবী কে প্রমাণ করে। তেমনিভাবে কেউ দ্বীনের অর্থ করে হুকুমতে ইসলামী।

এখান থেকে ঈমান মুফাসসালে বর্ণিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

১. আল্লাহ তা‘আলার ওপর ঈমান

আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোন প্রকার অংশ বা অংশীদার বা শরীক নেই, তাঁর কোন কিছুর অভাব নেই। তিনিই সকলের সব অভাব পূরণকারী। তিনি কারো পিতা নন, পুত্রও নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। কোন জ্ঞান বা চক্ষু আল্লাহ তা'আলাকে আয়ত্ত করতে পারে না। তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার বিষয়ে তিনটি কথা অবশ্যই মানতে হবে। ক. তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় । তাঁর কোন শরীক নেই। সৃষ্ট জীবের সাথে তাঁর কোন তুলনা হয় না।

খ. তাঁর অনেকগুলো অনাদি-অনন্ত সিফাত বা গুণ আছে, সেগুলো একমাত্র তাঁর জন্যেই নির্ধারিত।

সেসব গুনের মধ্যে অন্য কেউ শরীক নেই। যেমন: তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, হায়াত-মওতদাতা, বিধানদাতা, গায়েব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। অন্য সবকিছুই ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল, কিন্তু তাঁর ক্ষয়ও নেই, ধ্বংসও নেই। সবকিছুর ওপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সবকিছুর ওপরই তাঁর ক্ষমতা চলে। আল্লাহ তা‘আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, সব-ই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি আগুণকে পানি এবং পানিকে আগুণ করতে পারেন। এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আকাশ, বাতাস, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান, তিনি হুকুম করলে মুহূর্তের মধ্যে এসব নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি না জানেন-এমন কিছুই নেই। মনের মধ্যে যে ভাবনা বা কল্পনা উদয় হয়, তাও তিনি জানেন। তিনি সবকিছুই দেখছেন। সবকিছুই শুনছেন। মৃদু আওয়াজ এমনকি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ আওয়াজও তিনি শুনেন। গাইবের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউ গাইব জানেন না। এমনকি নবী-রাসূল

অলী ও নন। আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র হাযির-নাযির। তিনি ছাড়া আর কেউ হাযির নাযির নন। এমনকি নবী-অলীগণ ও নন।

তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। কোন পীর, ওলী, পয়গাম্বর বা ফেরেশতা তাঁর ইচ্ছাকে রদ বা প্রতিহত করতে পারে না। তিনি আদেশ ও নিষেধ জারি করেন।

তিনি একমাত্র বন্দেগীর উপযুক্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না। অন্য কারো ইবাদত-বন্দেগী করা যায় না।
তাঁর কোন অংশীদার কিংবা সহকর্মী বা উযীর-নাযীর নেই। তিনি একক কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনিই সর্বোপরি বাদশাহ, রাজাধিরাজ; সবই তাঁর বান্দা ও গোলাম । তিনি বান্দাদের ওপর বড়ই মেহেরবান।

তিনি সব দোষ-ত্রূটি হতে পবিত্র। তাঁর মাঝে আদৌ কোন রকমের দোষ-ত্রূটি নেই। তাঁর ক্রিয়া-কর্ম, আদেশ-নিষেধ সবই ভালো ও মঙ্গলময়, কোন

একটিতেও বিন্দুমাত্র অন্যায় বা দোষ নেই। তিনিই বিপদ-আপদ দেন এবং বিপদ-আপদ হতে উদ্ধার করেন, অন্য কেউ কোন প্রকার বিপদ-আপদ হতে মুক্তি দিতে পারে না।

প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা তাঁরই। তিনিই সকল সম্মান ও মর্যাদার অধিপতি। তিনিই প্রকৃত মহান। একমাত্র তিনিই নিজেকে নিজে বড় বলতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কারো এ রকম বলার ক্ষমতা ও অধিকার নেই। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং সৃষ্টি করবেন।

তিনি এমন দয়ালু যে, দয়া করে অনেকের গুনাহ তিনি মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল।

তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তাঁর প্রভাব ও প্রভুত্ব সকলের ওপর; কিন্তু তাঁর ওপর কারো প্রভাব বা প্রভুত্ব চলে না।

তিনি বড়ই দাতা। সমস্ত জীবের ও যাবতীয় চেতন-অচেতন পদার্থের আহার তিনি দান করেন।

তিনি রুযীর মালিক। রুযী কমানো-বাড়ানো তাঁরই হাতে। তিনি যার রুযী কমাতে ইচ্ছা করেন, তার রুযী কম করে দেন। যার রুযী বাড়াতে ইচ্ছা করেন, বাড়িয়ে দেন।

কাউকে উচ্চপদস্থ বা অপদস্থ করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। এসবই তাঁরই ক্ষমতায়, তাঁরই ইখতিয়ারে। অন্য কারো এতে কোন রকম ক্ষমতা বা অধিকার নেই। তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে যার জন্যে যা ভালো মনে করেন, তার জন্যে তাই ব্যবস্থা করেন। তাতে কারো কোন প্রকার প্রতিবাদ করার অধিকার নেই।

তিনি ন্যায়পরায়ণ, তাঁর কোন কাজেই অন্যায় বা অত্যাচারের লেশমাত্র নেই।
তিনি বড় সহিষ্ণু, অনেক কিছু সহ্য করেন। কত পাপিষ্ঠ তাঁর নাফরমানী করছে, তাঁর ওপর কত রকম দোষারোপ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত

করছে, তারপরও তিনি তাদের রিযিক জারি রেখেছেন।

তিনি এমনই কদরশিনাস-গুণগ্রাহী এবং উদার যে, তাঁর আদৌ কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করলে এবং তাঁর আদেশ পালন করলে, তিনি তার বড়ই কদর করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে আশাতীত রূপে পুরস্কার দান করেন। তিনি এমনই মেহেরবান ও দয়ালু যে, তাঁর নিকট দরখাস্ত করলে [অর্থাৎ দু'আ করলে] তিনি তা মঞ্জুর করেন। তাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত, তাঁর ভাণ্ডারে কোন কিছুরই অভাব নেই।

তিনি অনাদি -অনন্তকাল ব্যাপী সকল জীব-জন্তু ও প্রাণিজগতের আহার যোগান দিয়ে আসছেন।

তিনি জীবন দান করেছেন, ধন-রত্ন দান করছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি দান করেছেন। অধিকন্তু আখিরাতেও অসংখ্য ও অগণিত সাওয়াব ও নেয়ামত দান করবেন। কিন্তু তাঁর ভাণ্ডার তবুও বিন্দুমাত্র কমেনি বা কমবে না।

তাঁর কোন কাজই হিকমত ও মঙ্গল ছাড়া নয়। কিন্তু সব বিষয় সকলের বুঝে আসে না। তাই নির্বুদ্ধিতা বশত কখনো না বুঝে দিলে দিলে বা মুখে প্রতিবাদ করে ঈমান নষ্ট করা উচিত নয়। তিনি সব কর্ম সমাধানকারী। বান্দা চেষ্টা করবে, কিন্তু সে কর্ম সমাধানের ভার তাঁরই কুদরতী হাতে ন্যস্ত।

তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কিয়ামতের দিন পুনর্বার সকলকে জীবিত করবেন। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তাঁর হাকীকত ও স্বরূপ এবং তিনি যে কত অসীম, তা কারো বোঝার ক্ষমতা নেই। কেবলমাত্র তাঁর সিফাত অর্থাৎ গুণাবলী ও তাঁর কার্যাবলীর দ্বারাই তাকে আমরা চিনতে পারি।

মানুষ পাপ করে যদি খাঁটিভাবে তাওবা করে, তবে তিনি তা কবুল করেন। যে শাস্তির উপযুক্ত, তাকে তিনি শাস্তি দেন। তিনি হিদায়ত দেন। তাঁর নিদ্রা নেই। সমস্ত বিশ্বজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও

তত্ত্বাবধানে তিনি বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত হন না। তিনিই সমস্ত বিশ্বের রক্ষক।

এ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাকে চিনবার জন্যে তাঁর কতগুলো সিফাতে কামালিয়া অর্থাৎ মহৎ গুণাবলীর বর্ণনা দেওয়া হলো। এতদ্ব্যতীত যত মহৎ গুণ আছে, আল্লাহ তা'আলা তৎসমুদয় দ্বারা বিভূষিত। ফলকথা এই যে, সৎ ও মহৎ যত গুণ আছে, অনাদিকাল যাবৎ সে সব আল্লাহ তা'আলার মধ্যে আছে এবং চিরকাল থাকবে। কিন্তু কোন দোষ ত্রুটির লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে নেই।

আল্লাহ তা'আলার গুণ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফের কোন কোন জায়গায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি আশ্চর্যান্বিত হন, হাসেন, কথা বলেন, দেখেন, শুনেন, সিংহাসনাসীন হন, নিম্ন আসমানে অবতীর্ণ হন। তাঁর হাত, পা, মুখ ইত্যাদি আছে। এসব ব্যাপারে কখনো বিভ্রান্তিতে পড়তে বা তর্ক-বিতর্ক করতে নেই। সহজ-সরলভাবে আমাদের আক্বীদা ও একীন এই রাখা উচিত যে,

আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্টজীবের মতো তাঁর ওঠা-বসা বা হাত-পা তো নিশ্চয়ই নয়। তবে কেমন? তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সাবধান! সাবধান!!! যেন শয়তান ধোঁকা দিয়ে গোলকধাঁধায় না ফেলতে পারে। একিনী আক্বীদা ও অটল বিশ্বাস রাখবেন যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্ঠজীবের সাদৃশ্য হতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান।

এ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারেনি। কখনো পারবেও না। তবে জান্নাতে গিয়ে জান্নাতীরা আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে। জান্নাত এটাই-সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হবে।

গ. একমাত্র তিনিই মাখলুকের ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত। আর কেউ ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আল্লাহ তা'লার ওপর ঈমান আনার অর্থ শুধু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা নয়; বরং অস্তিত্ব

স্বীকার করার সাথে সাথে তার উপরোক্ত গুণবাচক কথাগুলো স্বীকার করাও জরুরী। নতুবা আল্লাহপাকের ওপর সম্পূর্ণরূপে ঈমান আনা হবে না এবং সে ঈমান গ্রহণযোগ্যও হবে না।

আল্লাহর সিফাতী বা গুণবাচক ৯৯টি নাম

১. الرحمن	অত্যন্ত দয়াবান।
২. الرحيم	পরম দয়ালু।
৩. الملك	অধিপতি।
৪. القدوس	পবিত্র।
৫. السلام	শান্তিময়।
৬. المؤمن	নিরাপত্তা বিধায়ক।
৭. المهيمن	রক্ষক।
৮. العزيز	পরাক্রমশালী।
৯. الجبار	শক্তি প্রয়োগে সংশোধনকারী, প্রবল।
১০. المتكبر	মহিমান্বিত।
১১. الخالق	স্রষ্টা।

১২. البارئ	উদ্ভাবনকর্তা, ত্রুটিহীন স্রষ্টা।
১৩. المصور	আকৃতিদাতা।
১৪. الغفار	পরম ক্ষমাশীল।
১৫. القهار	মহা পরাক্রান্ত।
১৬. الوهاب	মহা দাতা।
১৭. الرزاق	রিযিকদাতা।
১৮. الفتاح	মহা বিজয়ী।
১৯. العليم	মহাজ্ঞানী।
২০. القابض	সংকোচনকারী।
২১. الباسط	সম্প্রসারণকারী।
৪৩. الرقيب	পর্যবেক্ষণকারী।
৪৪. المجيب	কবুলকারী।
৪৫. الواسع	সর্বব্যাপী।
৪৬. الحكيم	প্রজ্ঞাময়।
৪৭. الودود	প্রেমময়।
৪৮. المجيد	গৌরবময়।
৪৯. الباعث	পুনরুত্থানকারী।

৫০. الشهيد	প্রত্যক্ষকারী।
৫১. الحق	সত্যপ্রকাশক, হক।
৫২. الوكيل	কর্ম বিধায়ক।
৫৩. القوى	শক্তিশালী।
৫৪. المتين	দৃঢ়তাসম্পন্ন।
৫৫. الولي	অভিভাবক।
৫৬. الحميد	প্রশংসিত।
৫৭. المحصى	হিসাব গ্রহণকারী।
৫৮. المبدئ	আদি স্রষ্টা।
৫৯. المعيد	পুন:সৃষ্টিকারী।
৬০. المحيي	জীবনদাতা।
৬১. المميت	মৃত্যুদাতা।
৬২. الحي	চিরঞ্জীব।
৬৩. القيوم	স্বপ্রতিষ্ঠ সংরক্ষণকারী।
৬৪. الواجد	প্রাপক, তিনি যা চান তাই পান।
৬৫. الماجد	মহান।
৬৬. الواحد	একক।

৬৭	এক অদ্বিতীয়।
৬৮. الصمد	অনপেক্ষ।
৬৯. القادر	শক্তিশালী।
৭০. مقتدر	ক্ষমতাশালী।
৭১. المقدم	অগ্রবর্তীকারী।
২২. الخافض	পতনকারী, অবনমনকারী।
২৩. الرافع	উন্নয়নকারী।
২৪. المعز	সন্মানদাতা।
২৫. المذل	অপমানকারী।
২৬. السميع	সর্বশ্রোতা।
২৭. البصير	সম্যক দ্রষ্টা।
২৮. الحكم	মীমাংসাকারী।
২৯. العدل	ন্যায়নিষ্ঠ।
৩০. اللطيف	সুক্ষ্মদর্শী।
৩১. الخبير	সর্বজ্ঞ।
৩২. الحليم	ধৈর্যশীল।
৩৩. العظيم	মহিমাময়।

৩৪. الغفور	পরম ক্ষমাকারী।
৩৫. الشكور	গুণগ্রাহী।
৩৬. العلي	সর্বোচ্চ সমাসীন, অতি উচ্চ।
৩৭. الكبير	সুমহান।
৩৮. الحفيظ	মহারক্ষক।
৩৯. المقيت	আহার্যদাতা।
৪০. الحسيب	হিসাব গ্রহণকারী।
৪১. الجليل	মহিমান্বিত।
৪২. الكريم	অনুগ্রহকারী।
৭২. لمؤخرا	পশ্চাদবর্তীকারী।
৭৩. الأول	সর্বপ্রথম অর্থাৎ অনাদি।
৭৪. لآخرا	শেষ অর্থাৎ অনন্ত।
৭৫. لظاهرا	প্রকাশ্য।
৭৬.لباطنا	গুপ্তসত্তা।
৭৭. الوالي	অধিপতি।
৭৮. المتعال	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।
৭৯. البر	কৃপাময়।

www.darsemansoor.com

৮০. التواب	তওবা কবুলকারী।
৮১. المنتقم	শাস্তিদাতা।
৮২. العفو	ক্ষমাকারী।
৮৩. الرؤوف	দয়ার্দ্র।
৮৪. مالك الملك	সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
৮৫. ذو الجلال و الإكرام	মহিমাময় মহানুভব।
৮৬. المقسط	ন্যায়পরায়ণ।
৮৭. الجامع	একত্রকরণকারী।
৮৮. الغني	অভাবমুক্ত।
৮৯. المغني	অভাব মোচনকারী।
৯০. المانع	প্রতিরোধকারী।
৯১. لضارا	ক্ষতির ক্ষমতাকারী।
৯২. النافع	কল্যাণকারী।
৯৩. النور	জ্যোতির্ময়।
৯৪. الهادي	পথ প্রদর্শক।
৯৫. البديع	নমুনাবিহীন সৃষ্টিকারী।

৯৬. الباقي	চিরস্থায়ী।
৯৭. الوارث	স্বত্বাধিকারী।
৯৮. الرشيد	সত্যদর্শী।
৯৯. الصبور	ধৈর্যশীল।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে এবং হাদীস গ্রন্থসমূহে এসবের বাইরেও আরো কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন:

১.اَلرَّبُّ	প্রতিপালক।
২.اَلْمُنْعِمُ	নিয়ামতদানকারী।
৩.اَلْمُعْطِيْ	দাতা।
৪.اَلصَّادِقُ	সত্যবাদী।
৫.اَسَّتَّارُ	গোপনকারী।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে এবং হাদীস গ্রন্থসমূহে এসবের বাইরেও আরো কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরে ঐ পাঁচটি উল্লেখ করা হলো।

আল আসমাউল হুসনার যথাযথ বাংলা অনুবাদ কিছুতেই হয় না। এখানে যে বাংলা অর্থ দেওয়া হয়েছে, তা কেবল ইঙ্গিত মাত্র। আল আসমাউল হুসনার মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক গুণাবলী আল্লাহর জন্য সত্তাগত, অনাদি অনন্ত, ব্যাপক ও অসীম। আর মানুষের জন্য এ সকল গুণ কেবল আল্লাহর দেয়া অস্থায়ী এবং সীমিত।

২. ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ এক ধরণের মাখলুককে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করে তাদেরকে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন। তাদেরকে ফেরেশতা বলে। তাঁরা পুরুষ বা মহিলা কোনটিই নন। বরং তাঁরা ভিন্ন ধরনের মাখলুক। অনেক

ধরণের কাজ আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সোপর্দ করে রেখেছেন। যেমন: নবীগণের আ. নিকট অহী আনয়ন করা, মেঘ পরিচালনা করা, রুহু কবয করা, নেকী-বদী লিখে রাখা ইত্যাদি। তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তাঁরা বিন্দুমাত্র আল্লাহর নাফরমানী করেন না। তাঁরা আল্লাহর প্রিয় ও ফরমাবরদার বান্দা। তাঁদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা যথা: হযরত জিবরাঈল আ. হযরত মীকাঈল আ., হযরত ইসরাফীল আ. ও হযরত আযরাঈল আ. অতিপ্রসিদ্ধ ।

জিন সম্বন্ধে আক্বীদা

আরেক প্রকার জীবকে আল্লাহ তা'আলা আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করে আমাদের চক্ষুর অগোচর করে রেখেছেন। তাদেরকে জিন বলে। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সবরকম হয়। তারা নারী-পুরুষও বটে এবং তাদের সন্তানাদিও হয়। তাদের খানা-পিনার প্রয়োজনও হয়। জিন মানুষের ওপর আছর করতে পারে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও বড়

দুষ্ট হচ্ছে 'ইবলিশ শয়তান'। হাশরের ময়দানে জিনদেরও হিসাব-নিকাশ হবে। এ কথা কুরআনে কারীমে উল্লেখ আছে। সুতরাং তা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

৩. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান:

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো, এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি ও জিন জাতির হিদায়াতের জন্যে ছোট-বড় বহু কিতাব হযরত জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে পয়গাম্বরগণের আ. ওপর নাযিল করেছেন, তারা সে সব কিতাবের দ্বারা নিজ নিজ উম্মতকে দ্বীনের কথা শিখিয়েছেন। উক্ত কিতাবসমূহের মধ্যে চারখানা কিতাব বেশি প্রসিদ্ধ, যা প্রসিদ্ধ চারজন রাসূলের আ. ওপর নাযিল করা হয়েছে। তার মধ্যে কুরআন শরীফ সর্বশেষ কিতাব। এরপরে আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের হুকুমই চলতে থাকবে। পবিত্র কুরআনের কোন সূরা আয়াত

এমনকি কোন শব্দ হরকত, নুকতার মধ্যে এমনিভাবে অর্থের মাঝেও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিলুপ্তি আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসাও সম্ভব নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনের হিফাযতের ওয়াদা করেছেন এবং তা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। অন্যান্য কিতাবগুলোকে বেদ্বীন লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করে ফেলেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সেগুলোর হিফাযতের ওয়াদা করেন নি। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরা, প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি হরফ এমনকি প্রতিটি নুকতাহ ও হরকতের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। কোন একটি অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। কাফের হয়ে যাবে।

কুরআন শরীফ ও তার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে তিনি দ্বীন সম্বন্ধীয় সব কথা বর্ণনা করে দিয়েছেন। কোন অংশ গোপন রাখেন নি। সুতরাং, এখন নতুন কোন কথা বা প্রথা চালু করা দুরস্ত নয়। দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ নতুন কথাকে ইলহাদ বা বিদ'আত বলে। যা অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহ ও পথভ্রষ্টতা।

কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া কুফরী কাজ। কোন ফরযকে অস্বীকার করা কুফরী কাজ। তেমনিভাবে কোন হালালকে হারাম মনে করা বা কোন অকাট্য হারাম বা গুনাহকে হালাল হিসাবে বিশ্বাস করা কুফরী। এর দ্বারা ঈমান চলে যায়।

৪. নবী-রাসূল আ. এর ওপর ঈমান:

নবী-রাসূল আ.- এর ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা‘আলা মানুষের হিদায়াতের জন্যে এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য স্বীয় বান্দাদের মধ্যে হতে বাছাই করে বহুসংখ্যক পয়গাম্বর অর্থাৎ নবী-রাসূল আ. মনোনীত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যাতে করে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে দুনিয়াতে কামিয়াব হতে পারে এবং পরকালে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে বেহেশত হাসিল করতে পারে।

পয়গাম্বরগণ সকলেই মাসুম বা নিষ্পাপ। তাঁরা কোন প্রকার পাপ করেন না। নবীগণ মানুষ। তাঁরা খোদা নন। খোদার পুত্র নন। খোদার রূপান্তর

(অবতার) নন। বরং তাঁরা হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি। নবীগণ আল্লাহর বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের সঠিক সংখ্যা কুরআন শরীফ বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে বর্ণনা করেন নি। কাজেই নিশ্চিতভাবে তাঁদের সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারে না। এ কথা যদি ও প্রসিদ্ধ যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন কিন্তু কোন সহীহ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত নয়। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বহুসংখ্যক পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে তাঁদের দ্বারা অনেক অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঐ সব ঘটনাকে মু‘জিযা বলে। নবীগণের মু‘জিযাসমূহ বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গ।

পয়গাম্বরগণের আ. মধ্যে সর্বপ্রথম দুনিয়াতে আগমন করেছেন হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ অথচ সর্বপ্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আমাদের নবী

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে অন্য কেউ দুনিয়াতে নবী বা রাসূল হিসেবে আগমন করেননি এবং করবেনও না। হযরত ঈসা আ. কিয়ামতের পূর্বে যদিও আগমন করবেন, কিন্তু তিনি তো পূর্বেই নবী ছিলেন। নতুন নবী হিসেবে তিনি আগমন করবেন না। আমদের নবী খাতামুন নাবিয়্যীন বা শেষনবী। তাঁর পরে নতুনভাবে আর কোন নবী আসবেন না; তারপর আসল বা ছায়া কোনরূপ নবীই নাই। বরং তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের নবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যত জিন বা ইনসান ছিল, আছে বা সৃষ্টি হবে, সকলের জন্যেই তিনি নবী। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই হুকুম এবং তরীকা সকলের মুক্তি ও নাজাতের জন্যে অদ্বিতীয় পথ হিসেবে বহাল থাকবে। অন্য কোন ধর্ম, তরীকা বা ইজম এর অনুসরণ কাউকে আল্লাহর দরবারে কামিয়াব করতে পারবে না। আমাদের নবীর পরে

অন্য কেউ নবী হয়েছেন বা নবী হবেন বলে বিশ্বাস করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কেউ নতুন নবী হওয়ার দাবি করলে বা তার অনুসরণ করলে, সেও কাফির বলে গণ্য হবে।

হযরত ঈসা আ. এখনও আসমানে জীবিত আছেন। তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন, ইহা সত্য। কুরআন হাদীসে প্রমাণিত। তাই ইহা বিশ্বাস করতে হবে, অন্যথায় ঈমান থাকবে না, তিনি কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে জমিনে অবতরণ করবেন। আমাদের নবীর অনুসারী হয়ে। হযরত ঈসা আ.- এর ব্যাপারে পুত্রবাদ ও কর্তৃত্বদের বিশ্বাস কুফরী।

দুনিয়াতে যত পয়গাম্বর এসেছেন, সকলেই আমাদের মাননীয় ও ভক্তির পাত্র। তাঁরা সকলেই আল্লাহর হুকুম প্রচার করেছেন। তাঁদের মধ্যে পরস্পরে কোন বিরোধ ছিল না। সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ছিলেন। হ্যাঁ, আল্লাহ তা‘আলা অবশ্য হিকমতের কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হুকুম জারি

করেছেন। আর এই সামান্য বিভিন্নতাও শুধু আমলের ব্যাপারে, ঈমান আকীদার ব্যাপারে নয়। আকীদাসমূহ আদি হতে অন্ত পর্যন্ত চিরকাল এক। আক্বীদার মধ্যে কোন প্রকার রদবদল বা পরিবর্তন হয়নি, আর হবেও না কখনো। পয়গাম্বরগণ সকলেই কামিল ছিলেন। কেও নাকিস বা অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কারো মর্যাদা ছিল বেশি, কারো মর্যাদা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সকল নবী নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। এজন্য নবীগণকে 'হায়াতুন্নবী' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্তবা সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই বলে নবীগণের মধ্যে তুলনা করে একজনকে বড় এবং একজনকে হেয় বা ছোট করে দেখানো বা বর্ণনা করা নিষেধ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম-এর সমস্ত কথা মেনে নেয়া জরুরী। তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করলে বা সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে কিংবা

তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে বা দোষ বের করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

ঈমানের জন্যে আমাদের নবীর সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মি‘রাজ ভ্রমণের কথা বিশ্বাস করাও জরুরী। যে মি‘রাজ বিশ্বাস করে না, সে বেদ্বীন। তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে।

সাহাবীর পরিচিতি

যেসব মুসলমান আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বচক্ষে দেখেছেন, এবং ঈমানের হালতে ইনতিকাল করেছেন, তাঁদেরকে ‘সাহাবী’ বলা হয়।

সাহাবীগণের অনেক ফযীলতের কথা কুরআন ও হাদীসে এসেছে। সমস্ত সাহাবী রা. গণের সাথে মুহাব্বত রাখা ও তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

তাঁদের কাউকে মন্দ বলা আমদের জন্যে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। সাহাবীগণ যদিও মাসুম বা

নিষ্পাপ নন, কিন্তু তাঁরা মাগফূর বা ক্ষমাপ্রাপ্ত। সুতরাং, পরবর্তী লোকদের জন্য তাঁদের সমালোচনা করার কোন অধিকার নেই। তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

তাঁরা সকলেই আদিল অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী এবং সত্যের মাপকাঠি। তাঁদের দোষ চর্চা করা হারাম এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজ। ‘আকীদাতুত তাহাবী’ কিতাবে উল্লেখ আছে, ‘সাহাবীগণের প্রতি মুহাব্বত-ভক্তি রাখা দ্বীনদারী ও ঈমানদারী এবং দ্বীনের ও ঈমানের পূর্ণতা। আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাদের বিরূপ সমালোচনা করা কুফরী, মুনাফেকী এবং শরী‘আতের সীমার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সমস্ত সাহাবীগণের মাঝে চারজন সর্বপ্রধান। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা., তিনিই প্রথম খলীফা বরহক এবং তিনি সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রা., তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান

গণী রা. এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রা.। সকল সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার চির সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন। বিশেষ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। এই দশজনকে আশারায়ে মুবাশশারা (সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। তাঁরা হলেন -১. হযরত আবু বকর রা., ২. হযরত ওমর ফারুক রা., ৩। হযরত উসমান রা. ৪. হযরত আলী রা., ৫. হযরত তালহা রা., ৬. হযরত যুবায়ের রা. ৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা., ৮. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস রা., ৯. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রা., ১০. হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.

নবী আ. এর বিবি ও আওলাদ সম্বন্ধে আক্বীদা

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবি ও আহল-আওলাদগণের রা. বিশেষভাবে তাযীম করা উম্মতের ওপর ওয়াজিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.darsemansoor.com

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আওলাদগণের মধ্যে হযরত ফাতিমা রা. এবং বিবিগণের মধ্যে হযরত খাদীজা ও আয়িশা রা. এর মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।

ওলী-বুযুর্গদের সম্বন্ধে আক্বীদা

ওলী-বুযুর্গদের কারামত সত্য। কিন্তু ওলী-বুযুর্গগণ যত বড়ই হোন না কেন, তাঁরা নবী রাসূল আ. তো দূরের কথা, একজন সাধারণ সাহাবীর সমতুল্যও হতে পারেন না। অবশ্য হক্কানী পীর-মাশায়িখ ও উলামায়ে কিরাম যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়ারিশ এবং দ্বীনের ধারক বাহক সুতরাং, তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা, তাঁদের সঙ্গ লাভ করা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ না রাখা সকল মুসলমানের জন্য জরুরী। দ্বীনের খাদিম হিসেবে তাঁদেরকে হেয় করা, কিংবা গালি দেয়া কুফরী কাজ। মানুষ যতই খোদার পেয়ারা হোক, হুঁশ-জ্ঞান থাকতে শরী‘আতের হুকুম-আহকামের পাবন্দী অবশ্যই তাকে করতে হবে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত কখনো মাফ হবে না। তেমনিভাবে মদ

খাওয়া, গান-বাদ্য করা, পরস্ত্রী দর্শন বা স্পর্শ করা কখনো তার জন্যে জায়িয হবে না। হারাম বস্তুসমূহ হারামই থাকবে এবং হারাম কাজ করে বা ফরয বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে কেউ কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারে না।

৫. কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান

কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান আনার অর্থ-কুরআন ও হাদীসে কিয়ামতের যতগুলো নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই ঘটবে-দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করা। যেমন- বিশ্বাস করা যে, ইমাম মাহদী রহ. আবির্ভূত হবেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে বাদশাহী করবেন। ‘কানা দাজ্জাল’ অনেক অনেক ফিতনা-ফাসাদ করবে, তাকে খতম করার জন্য হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং তাকে বধ করবেন। ‘ইয়াজুজ মা’জুজ’ অতিশক্তিশালী পথভ্রষ্ট শ্রেণীর মানুষ। তারা দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে দেবে। অতঃপর আল্লাহর গযবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। ‘দাব্বাতুল

আরদ’ নামে এক আশ্চর্য জানোয়ার পৃথিবীতে জাহির হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে।

কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে, তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কুরআন শরীফ উঠে যাবে। এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা ঘটবে। তারপরে কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত মু‘মিনগণ মারা যাবেন এবং সমস্ত দুনিয়া কাফিরদের দ্বারা ভরে যাবে।আর তাদের উপর কিয়ামত কায়িম হবে।

সারকথা, কিয়ামতের সকল নিদর্শন যখন পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফীল আ. শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন । তাতে কতিপয় জিনিস ব্যতীত সব ধ্বংস হয়ে যাবে, আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সমস্ত জীবজন্তু মরে যাবে, যারা পূর্বে মারা গেছে, তাদের রুহ বেঁহুশ হয়ে যাবে। অনেক দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে। আল্লাহর নির্দেশে তারপর আবার-শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। তাতে সমস্ত

আলম আবার জীবিত হয়ে উঠবে এবং কেয়ামতের ময়দানে সকলে একত্রিত হবে।

কিয়ামতের দিন সূর্য অতি নিকটে চলে আসবে। ফলে মানুষের খুব কষ্ট হবে। কষ্ট দূর করার জন্য লোকেরা হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে বড় বড় নবীগণের আ. নিকট সুপারিশের জন্য যাবে। কিন্তু কেউ সুপারিশ করার সাহস পাবে না। অবশেষে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফাআতে হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।

মীযানের মাধ্যমে নেকী-বদীর হিসাব হবে। অনেকে বিনা হিসেবেই বেহেশতে চলে যাবে, আবার অনেককে বিনা হিসেবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হিসাবের পর নেককারদের ডান হাতে এবং বদকারদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

সেদিন জাহান্নামের উপরে অবস্থিত পুলসিরাতের উপর দিয়ে সকলকে পার হতে হবে। নেককার লোকেরা তা দ্রুত পার হয়ে যাবেন, কিন্তু বদকার

লোকেরা পার হওয়ার সময় পুলসিরাতের নিচে অবস্থিত দোযখের মধ্যে পড়ে যাবে।

সেই কঠিন দিনে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতদেরকে হাউজে কাউসারের শরবত পান করাবেন। তা এমন তৃপ্তিকর হবে, যা পান করার পর পিপাসার নামমাত্র থাকবে না। জাহান্নামের মাঝে ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডসহ বিভিন্ন রকম শাস্তির উপকরণ মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, সে যত বড় পাপী হোক না কেন, স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করবে, অতঃপর নবীগণের আ. কিংবা অন্যদের সুপারিশে দোযখ হতে মুক্তি লাভ করে কোন এক সময় বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যারা কুফরী করেছে, বা শিরকী করেছে, তারা যদি দুনিয়াতে অনেক ভাল কাজও করে থাকে, তথাপি তারা কখনো কিছুতেই দোযখ হতে মুক্তি পাবে না। দোযখীদের কখনো মৃত্যুও আসবে না। তারা চিরকাল শাস্তিই ভোগ করতে থাকবে এবং তাদের কোন আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হবে না।

দোযখের ন্যায় বেহেশতকেও আল্লাহ তা‘আলা পূর্ব হতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। সেখানে নেক লোকদের জন্যে অগণিত ও অকল্পনীয় শান্তির সামগ্রী ও নেয়ামত মওজুদ আছে। যে একবার বেহেশতে যাবে, তার আর কোন ভয় বা ভাবনা থাকবে না। এবং কোনদিন তাকে বেহেশত থেকে বের হতে হবে না। বরং চিরকাল সেখানে জীবিত অবস্থায় থেকে সুখ-শান্তি ভোগ করতে থাকবে।

বেহেশতের সকল নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার দীদার বা দর্শন লাভ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নেয়ামত। যদিও দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে কেউ আল্লাহ তা‘আলাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু মু‘মিনগণ বেহেশতের মধ্যে আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হবেন। বেহেশতের মধ্যে বাগ-বাগিচা, বালাখানা, হুর-গিলমান, বিভিন্ন রকম নহর ও নানারকম অকল্পনীয় সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী সর্বদা মওজুদ থাকবে। জান্নাতীদের দিলের কোন নেয়ামত ভোগ করার ইচ্ছা হওয়ার সাথে সাথে তা পূর্ণ হবে।

দুনিয়াতে কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যায় না। অবশ্য কুরআন-হাদীসে যাদের নাম নিয়ে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে বলা যাবে। তবে কারোর ভাল আমল বা ভাল আখলাক দেখে তাকে ভাল মনে করা উচিত।

৬. তাকদীরের ওপর ঈমান

তাকদীরের ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, মনে-প্রাণে অটল বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সমগ্র বিশ্বজগতে ভালো বা মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানেন, লাউহে মাহফুযে তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি যেমন জানেন তেমনই হয়, তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা। তার ক্ষমতা সর্বব্যাপী । তার ক্ষমতা ছিন্ন করে বের হতে পারে, এমন কেউ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, আদি-অন্ত সবকিছুই তিনি সঠিকভাবে জানেন।

মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা ভাল-মন্দ বুঝবার এবং কাজ করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং ইচ্ছাশক্তিও দান করেছেন। তার দ্বারা নিজ ক্ষমতায়, নিজ ইচ্ছায় সে পাপ ও পুণ্যের কাজ করে। পাপ কাজ করলে আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হন এবং পুণ্যের কাজ করলে সন্তুষ্ট হন। কাজ করা ভিন্ন কথা, আর সৃষ্টি করা ভিন্ন কথা। সৃষ্টি তো সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলা করেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে দান করেছেন।

মানুষ জীবনভর যতই ভাল বা মন্দ থাকুক না কেন, যে অবস্থায় তার ইনতিকাল হবে, সে হিসেবে শান্তি বা শাস্তি পাবে। যেমন, এক ব্যক্তি সারাজীবন মু‘মিন ছিল, কিন্তু মউতের পূর্বে ইচ্ছা পূর্বক কুফরী বা শিরকী কথা বললো বা ঈমান বিরোধী কাজ করলো, তাহলে সে কাফির সাব্যস্ত হবে। সুতরাং, দিলের মধ্যে আল্লাহর রহমতের আশা ও গযবের ভয় রাখা জরুরী। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের অসাধ্য কোন হুকুম করেননি। যা কিছু আদেশ করেছেন বা

নিষেধ করেছেন, সবই বান্দার আয়ত্তে ও ইখতিয়ারে।

আল্লাহ তা‘আলার ওপর কোন কিছু করা ওয়াজিব নয়। তিনি যা কিছু দান করেন, সবই তাঁর রহমত এবং মেহেরবানী মাত্র। তাঁর ওপর কারো কোনরূপ দাবি বা হুকুম কিংবা কর্তৃত্ব চলে না। ছোট হতে ছোট গুনাহের কারণে তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং বড় থেকে বড় পাপও তিনি মার্জনা করতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি কাউকে দোযখে দিলে, সেটাই ইনসাফ এবং কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করালে, সেটা তার রহমত। আপত্তি করার অধিকার কারো নেই।

৭। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, আমাদের বর্তমান জীবন পরীক্ষার নিমিত্ত। মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে এ জীবনের সকল বিষয়ের হিসাব নিবেন। মৃত্যুর পর একটি

রয়েছে কবরে সাময়িক ফলভোগের বরযখী যিন্দেগী, আর পরবর্তীতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর আসবে পরকালীন আসল যিন্দেগী। পূর্ণাঙ্গ হিসাব-কিতাবের পর বান্দার জন্যে নির্ণীত হবে বেহেশত বা দোযখের সেই অনন্ত যিন্দেগী।

কিয়ামতের পূর্বেই মুনকার-নাকীরের প্রশ্নোত্তরের পর কবরের ভিতরে নেককারদের জন্যে শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করা হয় এবং বদকারদের জন্যে আযাব শুরু হয়ে যায়।

কবর দ্বারা উদ্দেশ্য, আলমে বরযখ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের যিন্দেগীর মধ্যবর্তী যিন্দেগী। সকল মানুষ ইনতিকালের পর সেখানেই পৌঁছে যায়, তাই তাকে কবর দেয়া হোক বা না-ই হোক। যেমন- অনেককে বাঘ বা কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলে, কতেককে আগুনে জ্বালানো হয়, তারাও সেখানে উপস্থিত হয়। কবর বলে মূলত এ জগতকেই বোঝানো হয়। নেক লোকদের জন্যে কবর জান্নাত বা বেহেশতের একটা অংশ হয়ে যায়। তারা

সেখানে আরামের সাথে অবস্থান করতে থাকে। মৃত ব্যক্তির জন্যে দু‘আ করলে বা কিছু সদকা করলে, সে তা পেয়ে খুশি হয় এবং তাতে তার বড়ই উপকার হয়।

উল্লেখ্য, ঈমানে মুফাসসালের এ অংশটি ভিন্ন কোন বিষয় নয়, বরং ৫নং বিষয় অর্থাৎ কিয়ামতের ওপর ঈমান আনারই একটি স্তর; কিন্তু বিষয়টি জটিল ও সূক্ষ্ম হওয়ায় ভালভাবে বোঝানোর লক্ষ্যে আলাদা ধারার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হলো সহীহ ঈমানের সাতটি আরকান এবং তার কিছুটা ব্যাখ্যা ও তাফসীর। যে কোন ব্যক্তি এসব কথার সবগুলোকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে এবং এগুলোর দাবী অনুযায়ী আমলে সালিহা করবে, কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাকে বলা হবে পরিপূর্ণ মু‘মিন ও মুসলিম। আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদা যে, তাকে দুনিয়াতে, বরযখে ও আখিরাতে ইজ্জত ও শান্তির সাথে রাখবেন এবং তাকে সকল প্রকার আযাব-গযব ও কষ্ট-পেরেশানি

থেকে হিফাযত করবেন। কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে হিফাযত করে তাকে আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টির সংবাদসহ মহাসুখের আবাস ও আনন্দের জান্নাত দান করবেন।

আর যে ব্যক্তি উল্লেখিত কথাগুলোর সবগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস তো করে, কিন্তু অলসতা বা গাফলতির কারণে কথাগুলোর দাবির ওপর আমল করে না বা আংশিকভাবে আমল করে, তাকে শরী‘আতের দৃষ্টিতে ফাসিক বা গুনাহগার মু‘মিন বলা হয়। তার গুনাহসমূহকে আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তাকে আযাব ও দিতে পারেন। তবে সে ব্যক্তি তার ঈমানের বদৌলতে অবশ্যই জান্নাতে যাবে; সরাসরিও যেতে পারে, অথবা তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাতে যেতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়সমূহকে অবিশ্বাস করবে, অথবা এগুলো থেকে মাত্র কোন একটি বিষয়কে অবিশ্বাস করবে কিংবা তাতে সন্দেহ

পোষণ করবে, অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, কিংবা এগুলোর মধ্যে কোন দোষ বের করবে, তার ঈমান থাকবে না। বরং সে কাফের বলে গণ্য হবে। আর যদি পূর্ব থেকে মুসলমান থেকে থাকে, তারপরে তার থেকে এ ধরনের অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) বলা হবে, যদিও সে মুসলমান হওয়ার দাবি করে এবং যদিও সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে পড়ে, মাথায় টুপি ও মুখে দাড়ি রাখে রাখে বা হজ্ব-উমরা পালন করে। এসব আমল পরকালে তার কোন কাজে আসবে না। কারণ এ কাজগুলো নেক আমল। আর কেউ নেক আমল করলেই সে মু'মিন গণ্য হয় না। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যামানায় অনেক মুনাফিক অর্থাৎ নিকৃষ্ট কাফির ছিল, তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে সকল নেক কাজে অংশ গ্রহণ করতো। এমনকি জিহাদেও শরীক হতো। তারপরও তারা মু'মিন বলে গণ্য হয়নি।

বস্তুত ঈমান ভিন্ন জিনিস এবং আমল ভিন্ন জিনিস। সহীহ ঈমানের সাথে আমল দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা পৌঁছায়। আর আমল ব্যতীত শুধু ঈমানও ফায়দা দেয় না। কারণ, এমন ঈমানদার, যার নিকট নেক আমল নেই, সেও কোন এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল দুনিয়াতে কিছু ফায়দা পৌঁছালেও যেমন, তার সুনাম হয় বা ব্যবসা বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে ইত্যাদি, কিন্তু আখিরাতে ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল কোনই কাজে আসবে না।

এ সকল বিষয় স্পষ্টভাবে জানা থাকা জরুরী। যাতে ফিতনা-ফাসাদের যুগে ঈমান রক্ষা করা সহজ হয়। হাদীস-শরীফে আছে, ফিতনার যামানায় অনেক মানুষ সকালে মু'মিন থাকবে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৩, মুসলিম শরীফ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৫]

অর্থাৎ লোকেরা ইলমে দ্বীন শিখবে না, হক্কানী উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পর্ক রাখবে না;

অপরদিকে বদদ্বীনীর সয়লাব ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হবে। এমনকি দ্বীনের নামে কুফর ও শিরকের প্রচার করা হবে; তখন মানুষ না বুঝে কুফরকে দ্বীন মনে করে গ্রহণ করে কাফির হয়ে যাবে। [আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাযত করুন।]

এখন দেখতে হবে, এসব সহীহ আক্বীদা ও বিশ্বাস মুসলমানগণ কতটুকু ধরে রেখেছে এবং কতটুকুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে সহীহ আক্বীদাকে বিগড়ে ফেলেছে। এ পর্যায়ে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদাসমূহ বর্ণনার আশা রাখি। তবে তার পূর্বে ঈমানের বিবরণ আরো সবিস্তারে উপলব্ধির জন্যে ঈমানের ৭৭ শাখার বর্ণনা করা হচ্ছে।

মুসলমানদের আরো কতিপয় আক্বীদা বিশ্বাস

আল্লাহর দীদার তথা সাক্ষাৎ সম্পর্কে আক্বীদা

আল্লাহর দীদার বা আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে ইসলামের আক্বীদা হল, দুনিয়াতে থেকে জাগ্রত অবস্থায় এই চর্মচক্ষুর দ্বারা কেউ আল্লাহকে কখনো

দেখতে পারে নি। এবং পারবেও না। তবে বেহেশত বাসীগণ বেহেশতে গিয়ে আল্লাহর দীদার তথা দর্শন লাভ করবেন। বেহেশত বাসীদের জন্য এটি হবে একটি নেয়ামত এবং বেহেশতের অন্য সকল নেয়ামতের তুলনায় এই নেয়ামত [আল্লাহর দীদার] সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে হবে।

উল্লেখ্য যে, স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা যায়। তবে সে দেখাকে দুনিয়ার চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা বলা হয় না। সুতরাং কেউ আল্লাহকে স্বপ্নে দেখলে তা বাস্তবে আল্লাহকে দেখা হবে না।

আরশ-কুরসী সম্পর্কে আক্বীদা

আরশ অর্থ সিংহাসন। আর কুরসী অর্থ চেয়ার বা আসন। আল্লাহ যেমন তাঁর আরশ বা কুরসী ও তেমনি শানের হবে। এটাই স্বাভাবিক। সপ্ত আকাশের উপর আল্লাহ তা'আলার আরশ ও কুরসী অবস্থিত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ ও কুরসী এত বিশাল ও বড় আকৃতির যে, তা সমগ্র আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এখানে মনে

রাখতে হবে যে, আল্লাহপাক কোন মাখলুকের ন্যায় ওঠাবসা করেন না। এবং তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানেও সীমাবদ্ধ নন। মাখলুকের তথা সৃষ্টিজীবের কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে আল্লাহর কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের তুলনা বা মিল হয়না। তারপরেও তার আরশ ও কুরসী থাকার কী অর্থ-তা অনুধাবন করা, বিশ্লেষণ করা মানব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। তাই আমাদের এ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না। আমাদেরকে শুধু আরশ ও কুরসী সম্পর্কে উল্লেখিত আক্বীদা বিশ্বাসটুকু রাখতে হবে। এর ঊর্ধ্বে আর কিছু কল্পনা করার অধিকার আমাদের নেই।

ইমাম মাহদী রহ. সম্পর্কে আক্বীদা

কিয়ামতের ছোট বড় আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর পরিশেষে এমন একটি সময় আসবে, যখন কাফির-মুশরিকদের প্রভাব খুব বেশি হবে। চতুর্দিকে খ্রিস্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। খায়বার নামক স্থান পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমন দুর্দশার সময় মুসলমানগণ তাদের বাদশাহ বানানোর জন্য হযরত মাহদীকে তালাশ করতে থাকবে, এক পর্যায়ে কিছু সংখ্যক সৎলোক মক্কায় বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ রত অবস্থায় হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পেয়ে তাকে চিনে ফেলবেন। এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে তাকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ সময় তাঁর বয়স হবে চল্লিশ বছর। ঐ সময় একটি গায়েবি আওয়াজ আসবে ইনিই আল্লাহর খলীফা -মাহদী।

হযরত ইমাম মাহদীর নাম হবে মুহাম্মদ। তাঁর পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ । তিনি হযরত ফাতিমা রাযি. এর বংশোদ্ভূত অর্থাৎ সায়্যিদ বংশীয় লোক হবেন। মদীনা তাঁর অবস্থান হবে। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরত করবেন। তাঁর দৈহিক গঠন ও আখলাক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ হবে। তিনি নবী হবেন না, তাঁর ওপর ওহীও অবতীর্ণ হবে না। তিনি মুসলমানদের খলীফা হবেন এবং আধিপত্য বিস্তারকারী খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ পরিচালনা করবেন এবং

তাদের দখল থেকে শাম, কনষ্টান্টিনোপল [বর্তমান ইস্তাম্বুল] প্রভৃতি অঞ্চল জয় করবেন। তাঁর আমলে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। এবং তার আমলেই হযরত ঈসা আ. অবতরণ করবেন। হযরত ঈসা আ. এর আগমনের কিছুকাল পরে তিনি ইনতিকাল করবেন।

হযরত ঈসা আ.এর দুনিয়াতে অবতরণ সম্পর্কে আক্বীদা

দাজ্জাল ও তার বাহিনী বাইতুল মুক্কাদ্দাসের চারদিকে ঘিরে ফেলবে। মুসলমানগণ আবদ্ধ হয়ে পড়বে। ইত্যবসরে একদিন ফজরের নামাযের ইকামত হওয়ার পর হযরত ঈসা আ. আকাশ থেকে ফেরেশতাদের ওপর ভর করে অবতরণ করবেন। বাইতুল মুক্কাদ্দাসের পূর্বদিকের মিনারার নিকট তিনি অবতরণ করবেন। এবং হযরত মাহদী এই নামাযের ইমামতি করবেন। নামাযের পর হযরত ঈসা আ. হাতে ছোট একটি বর্শা নিয়ে বের হবেন। তাঁকে দেখেই দাজ্জাল পলায়ন করতে আরম্ভ

করবে। হযরত ঈসা আ. তার পেছনে ছুটবেন এবং বাবে লুত নামক জায়গায় গিয়ে তাকে নাগালে পেয়ে বর্শার আঘাতে বধ করবেন। মুসলমানদের আক্বীদা অনুযায়ী হযরত ঈসা আ. কে আল্লাহ তা'আলা সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেননি। কিংবা ইহুদিরা তাকে শূলীতে চড়িয়েও হত্যা করতে পারেন নি। তিনি আকাশে জীবিত আছেন। তাঁকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারকের পাশেই দাফন করা হবে। হযরত ঈসা আ. তখন নবী হিসাবে আগমন করবেন না। বরং তিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হিসেবে এই দুনিয়াতে আগমন করবেন। এবং এই শরী'আত অনুযায়ী তিনি জীবন-যাপন ও খেলাফত পরিচালনা করবেন।

দাজ্জাল সম্পর্কে আক্বীদা

দাজ্জাল শব্দের অর্থ প্রতারক, ধোঁকাবাজ। এটি কিয়ামতের একটি অন্যতম আলামত। আল্লাহ

তা‘আলা শেষ জামানায় লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য একজন লোককে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। তার এক চোখ টেরা থাকবে, চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে। সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। তার কপালে লেখা থাকবে ‘কাফির’, সকল মু‘মিন সে লেখা পড়তে পারবে, ইরাক ও শাম দেশের মাঝখানে তার অভ্যুত্থান হবে। সে ইহুদি বংশোদ্ভূত হবে। প্রথমে সে নবুওয়তের দাবি করবে। তারপর ইস্পাহানে যাবে, সেখানে ৭০ হাজার ইহুদি তার অনুগামী হবে। তখন সে খোদায়ী দাবি করবে। লোকেরা চাইলে সে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেখাবে, মৃতকে জীবিত করে দেখাবে, কৃত্রিম বেহেশত দোযখ তার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বেহেশত হবে দোযখ আর তার দোযখ হবে বেহেশত। সে আরো অনেক অলৌকিক কাণ্ড দেখাতে পারবে। যা দেখে কাঁচা ঈমানের লোকেরা তার দলভুক্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এক ভীষণ ফেতনা ও ভীষণ পরীক্ষা হবে সেটা। দাজ্জাল একটা গাধার উপর সওয়ার

www.darsemansoor.com

হয়ে ঝড়ের বেগে সমগ্র ভূ-খণ্ডে বিচরণ করবে এবং মক্কা, মদীনা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ব্যতীত [এসব এলাকায় সে প্রবেশ করতে পারবে না। ফেরেশতাগণ এসব এলাকার পাহারায় থাকবেন।] সব স্থানে ফিতনা বিস্তার করবে। হযরত মাহদীর সময় তা আবির্ভাব হবে। সে সময় হযরত ঈসা আ. আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। এবং তারই হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। অভ্যুত্থানের পর দাজ্জাল সর্বমোট ৪০ দিন দুনিয়াতে থাকবে। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য হাদীসে নিচের এই দু‘আটি পড়তে বলা হয়েছে- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপত্তা চাই। [সূত্র : মিশকাত শরীফ।]

আকাশের এক ধরণের ধোঁয়া সম্পর্কে আক্বীদা

হযরত ঈসা আ. এর ইনতিকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে দ্বীনদারী কমে যাবে। চারিদিকে বেদ্বীনি শুরু হয়ে যাবে। এরই মাঝে এক সময় আকাশ থেকে একধরণের ধোঁয়া আসবে। যার ফলে মু'মিন মুসলমানদের সর্দির মতো ভাব হবে। আর কাফিররা বেহুঁশ হয়ে যাবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিষ্কার হবে।

ইয়াজুজ মা'জুজ সম্পর্কে আক্বীদা

দাজ্জালের ফিতনা ও তার মৃত্যুর পর আসবে ইয়াজুজ মাজুজের ফিতনা। এটাও কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত। ইয়াজুজ মাজুজ অত্যন্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষগোষ্ঠী। তাদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি হবে। তারা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। ভীষণ উৎপাত শুরু করবে। তারা সর্বত্র হত্যা এবং লুটতরাজ চালাতে থাকবে। [তারা বর্তমানে কোন দেশের কোথায় কী অবস্থায় অবস্থিত, কী তাদের বর্তমান পরিচয় তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে কুরআন-

হাদীসেও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাদের রাজত্ব ও উৎপাত চলাকালে হযরত ঈসা আ. এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহর হুকুমে তূর পর্বতে আশ্রয় নিবেন। হযরত ঈসা আ. ও মুসলমানরা তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা মহামারীর আকারে রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করবেন। বর্ণিত আছে-সেই রোগের ফলে তাদের ঘাড়ে এক ধরণের পোকা সৃষ্টি হবে। ফলে অল্প সময়ের মাঝেই ইয়াজুজ-মা'জুজের গোষ্ঠী সকলেই মরে যাবে। তাদের অসংখ্য মৃতদেহের পচা দুর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন হযরত ঈসা আ. এবং তার সঙ্গীদের দু'আয় আল্লাহ তা'আলা একধরণের বিরাটকার পাখী প্রেরণ করবেন। তাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। তারা মৃতদেহগুলো উঠিয়ে নিয়ে সাগরে বা যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে ফেলে দিবে। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। এবং সমস্ত ভূপৃষ্ঠ বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় সম্পর্কে আক্বীদা

এর কিছু দিন পর একদিন হঠাৎ একটি রাত তিন রাতের পরিমাণ লম্বা হবে। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে ত্যাক্ত হয়ে যাবে। গবাদি পশু বাইরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাবে এবং চিৎকার শুরু করবে। তারপর সূর্য সামান্য আলো নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে। তখন থেকে আর কারো ঈমান বা তাওবা কবুল হবে না। তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এর পূর্ব পর্যন্ত খোলা থাকবে। সূর্য মধ্য আকাশ পর্যন্ত এসে আল্লাহর হুকুমে আবার পশ্চিম দিকে গিয়েই অস্ত যাবে। তারপর আবার যথারীতি কিছুদিন পূর্বের নিয়ম মাফিক পূর্বদিক থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে অস্ত যেতে থাকবে। এবং পরিশেষে অস্ত হয়ে যাবে।

দাব্বাতুল আরদ সম্পর্কে আক্বীদা

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের কিছুদিন পর মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভুত আকৃতির এক জানোয়ার বের হবে। একে বলা হয় দাব্বাতুল

আরদ [ভূমির জন্তু]। এটিও কিয়ামতের একটি অন্যতম আলামত। এই প্রাণীটি মানুষের সাথে মানুষের ভাষায় কথা বলবে। সে অতি দ্রুত বেগে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। সে মু'মিনদের কপালে একটি নূরানি রেখা টেনে দিবে। ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে। এবং বেঈমানদের নাকের অথবা গর্দানের উপর সীল মেরে দিবে। ফলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে চিনতে পারবে। এই জন্তুর আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত সমূহের অন্যতম। এই জন্তুটির আকার আকৃতি সম্পর্কে ইবনে কাছীরে বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। এসবের অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়।

কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়ার অবস্থা ও কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে আক্বীদা

দাব্বাতুল আরদ গায়েব হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে একটি আরামদায়ক বায়ু প্রবাহিত হবে। তাতে ঈমানদারগণের বগলে কিছু অসুখ হবে এবং

তারা খুব সহজেই মারা যাবে। দুনিয়ায় কোনো ঈমানদার ব্যক্তি ও আল্লাহ আল্লাহ করার বা আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সারা দুনিয়ায় হাবশী কাফিরদের একসঙ্গে রাজত্ব চলবে। তারা বাইতুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করে ফেলবে। কুরআন শরীফ মানুষের অন্তর থেকে এবং কাগজ থেকে উঠে যাবে। তারপর হঠাৎ একদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এবং তখনই কিয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে। সিঙ্গার ফুঁকে প্রথম প্রথম হালকা আওয়াজ হবে। পরে এত বিকট ও ভীষণ হবে যে, সারা দুনিয়ার সমস্ত লোক মারা যাবে। আসমান ও জমিন ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। পূর্বে যারা মারা গেছে তাদের রুহুও বেহুঁশ হয়ে যাবে। সর্বশেষ সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

দু'আর মাঝে ওসিলা গ্রহণ প্রসঙ্গে আক্বীদা

দু'আ কবুল হওয়ার জন্য নবীদের বা কোন জীবিত বা মৃত নেককার লোকদের ওসিলা দিয়ে কিংবা কোন নেক কাজের ওসিলা দিয়ে দু'আ করা জায়িয

বরং তা মুস্তাহাব। [সূত্র : আহসানুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড।]

কারামত, কাশফ, এলহাম ও পীর বুযুর্গ বিষয়ে আক্বীদা

আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে বুযুর্গ এবং অলী বলা হয়। আর শরী` আতের বরখেলাফ চলে কেউ কখনো আল্লাহর প্রিয় বা অলী বা বুযুর্গ হতে পারে না। অতএব যারা শরী‘আত বিরোধী কাজ করে যেমন- নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, গাজা বা নেশা করে, বেগানা মহিলাকে স্পর্শ করে বা দেখে, গান বাদ্য ইত্যাদি করে তারা কখনো পীর বুযুর্গ নয়। তারা যদি অলৌকিক কিছু দেখায় তা হলে সেটা কারামত নয়। বরং বুঝতে হবে সেটা জাদু বা এ ধরণের কিছুটা একটা হয়ে থাকবে। আর জাদু ফাসিকদের থেকেই প্রকাশ হয়।

যেহেতু শয়তান বাতাসে উর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করতে পারে এ জন্য অনেক সময় শয়তান এসব লোকদের নিকট গায়েব জগতের অনেক খবরাখবর

জানিয়ে দেয়। এতে করে এসব শুনে মূর্খ লোকেরা তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং এভাবেই তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে। এসব দেখে তাদের ধোঁকায় পড়া যাবে না। এ সকল লোকদের কাছে গেলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

কাশফ ও এলহাম শরীআতের মুতাবিক হলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কোন বুযুর্গ বা পীর বিষয়ে এই আক্বীদা রাখা যে, তিনি সব সময়ে আমাদের অবস্থা জানেন, এটা সম্পূর্ণ শিরক। কোন পীর, বুযুর্গের হাতে বাইআত হলে তিনি নাজাতের ব্যবস্থা করবেন, পুলসিরাত পার করে দিবেন, এ ধরণের আক্বীদা রাখাও গুমরাহী বরং পীর বুযুর্গ কেবল ঈমান ও আমলের পথ দেখাবেন। আর এই ঈমান ও আমলই হবে নাজাতের ওসিলা।

কোনো পীর বুযুর্গের মর্যাদা চাই সে যত বড় হোক কস্মিনকালেও কোনো নবী বা সাহাবী থেকে বেশি বা তাদের সমানও হতে পারবে না।

ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে আক্বীদা

ঈসালে সওয়াব অর্থ সওয়াব রেসানী বা সওয়াব পৌঁছানো। মৃত মুসলমানদের নিয়তে আদায়কৃত নামায, রোযা, দান, সদকা, তাসবীহ, তাহলীল, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ইত্যাদি শারীরিক ও আর্থিক সকল ইবাদতের সওয়াব তাদের রুহে পৌঁছে থাকে। এটা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এক মতে ফরয ইবাদতের দ্বারাও ঈসালে সওয়াব করা যায়। এতে একদিকে নিজের দায়িত্বও আদায় হবে, অপরদিকে মৃতুব্যক্তিও সওয়াব পাবে।[সূত্র : ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড]

মাজার বিষয়ে আক্বীদা

মাজার শব্দের অর্থ যিয়ারতের জায়গা। সাধারণভাবে বুযুর্গদের কবর যেখানে যিয়ারত করা হয়, তাকে মাজার বলে। সাধারণভাবে কবর যিয়ারত দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয়। যেমন অন্তর নরম হয়, মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, আখিরাতের চিন্তা বাড়ে, ইবাদতে আগ্রহ বাড়ে ইত্যাদি। বিশেষভাবে

বুযুর্গদের কবর যিয়ারত করলে তাদের রূহানী ফয়েযও লাভ হয়। মাজারের এতটুকু ফায়দা অনস্বীকার্য। কিন্তু এছাড়া সাধারণ মানুষ মাজার ও মাজার যিয়ারত করা বিষয়ে এমন কিছু ভুল আক্বীদা বিশ্বাস পোষণ করে যার অনেকটাই শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত। এসব অবশ্যই পরিহার করতে হবে। যেমন :

মাজার বিষয়ে ভুল আক্বীদা

মাজারে গেলে বিপদাপদ দূর হয়।

মাজার তওয়াফ করলে সওয়াব হয়।

মাজারে গেলে আয়-উন্নতিতে বরকত হয়।

মাজারে গেলে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ হয়।

মাজারে গেলে মাকসুদ হাসিল হয়।

মাজারে টাকা পয়সা নজর-নিয়াজ দিলে ফায়দা হয়।

মাজারে গিয়ে সন্তান চাইলে সন্তান লাভ হয়।

মাজারে ফুল মোমবাতি আগরবাতি ইত্যাদি দেওয়াকে সওয়াবের কাজ মনে করা।

মাজারে মান্নত মানলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

বস্তুর ক্ষমতা সম্পর্কে আক্বীদা :

কোন আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কোন আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা আছে এমন বিশ্বাস করাও শিরক। তবে বস্তুর মাঝে যে ক্ষমতা দেখা যায় বা বস্তু থেকে যে প্রভাব প্রকাশ পায়, তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত। তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। তাই আল্লাহ ক্ষমতা না দিলে বা কখনো সাময়িকভাবে ক্ষমতা হরণ করে নিলে এর স্বাভাবিক কার্যকারিতাও প্রকাশ পাবে না। আল্লাহপাকের এরূপ ফায়সালা হলেই বস্তুর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রকাশ পায় না। বস্তু বিষয়ে এ হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা।

অলী, আবদাল, গাওস ও কুতুব বিষয়ে আক্বীদা

বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন, মানব জগতে বার প্রকার অলী-আউলিয়া রয়েছে। তারা হল-

১. কুতুব : তাকে কুতুবুল আলম কুতুবুল আকবার, কুতুবুল ইরশাদ ও কুতুবুল আকতাবও বলা হয়।

আলমে গায়েবের মধ্যে এ কুতুবকে আবদুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। তার দুজন উযীর থাকেন। যাদেরকে ইমামাইন বলা হয়। ডানের উযীরের নাম আবদুল মালিক। বামের উযীরের নাম আবদুর রব। এছাড়া আরো বার জন কুতুব থাকেন, সাত জন সাত একলীমে থাকেন, তাদেরকে কুতুবে একলীম বলা হয়। আর পাঁচ জন ইয়েমেনে থাকেন, তাদেরকে কুতুবে বেলায়েত বলা হয়। এই নির্দিষ্ট কুতুবগণ ব্যতীত অনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক গ্রামে থাকেন এক একজন করে।

২. ইমামাইন: ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৩. গাওস: গাওস মাত্র একজন থাকেন। কেউ কেউ বলেছেন, কুতুবকেই গাওস বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, কুতুব আর গাওস এক নয়। গাওস ভিন্ন। তিনি মক্কা শরীফে থাকেন।

৪. আওতাদ: আওতাদ চারজন। পৃথিবীর চার কোনে চার জন থাকেন।

৫. আবদাল: আবদাল থাকেন চল্লিশ জন।

৬. আখয়ার: তারা থাকেন পাঁচশ জন কিংবা সাতশ জন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা ভ্রমণ করতে থাকেন।

৭. আবরার: অধিকাংশ বুযুর্গানেদ্বীন আবদালগণকেই আবরার বলেছেন।

৮. নুকাবা: নুকাবা আলী নামে ৩০০ জন পশ্চিম দেশে থাকেন।

৯. নুজাবা: নুজাবা হাসান নামে ৭০ জন মিসরে থাকেন।

১০. আমূদ: আমূদ মুহাম্মদ নামে চারজন পৃথিবীর চার কোণে থাকেন।

১১. মুফাররিদ: গাওসই উন্নতি করে ফারদ বা মুফাররিদ হয়ে যান। আর ফারদ উন্নতি করে কুতুবুল আহদাত হয়ে যান।

১২. মাকতুম: মাকতুম শব্দের অর্থ লুকায়িত। অর্থ যেমন তারাও তেমনি লুকায়িত থাকেন।

www.darsemansoor.com

উল্লেখ্য, অলীদের এই প্রকার এবং এই বিবরণ সম্পর্কে হাদীসে খুলে কিছু বলা হয়নি, শুধু বুযুর্গানেদ্বীনের কাশফ দ্বারা এটা জানা গেছে। আর কাশফ যার হয় তার জন্য সেটা দলিল। অন্যদের জন্য সেটা দলিল নয়। অতএব এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা তর্কবিতর্ক করা ঠিক নয়।

রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আক্বীদা

রাশি হল সৌর জগতের কতগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয়। যথা- মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র [অর্থাৎ ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology এর ধারণা অনুযায়ী এসব গ্রহ নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যৎ শুভ-অশুভ সংঘটিত হতে পারে। এভাবেই শুভ অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আক্বীদা অনুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোনো প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। [সূরা-আনআম,আয়াত-৫৭]

সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে, এই আক্বীদা রাখা শিরক। তবে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোনো প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। কুরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। যদি প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোনো প্রভাব থাকেও তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। অতএব, শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও তারই নিয়ন্ত্রণে। [সূত্র : ফাতহুল মুলহিম।]

রোগ সংক্রমণ বিষয়ে আক্বীদা

জনসমাজে ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে, সে সম্পর্কে ইসলামের আক্বীদা হল, কোন রোগের মধ্যে সংক্রমণের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। তাই দেখা যায়, তথাকথিত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের কাছে যাওয়ার পরও অনেকে আক্রান্ত হয় না, তাছাড়া ডাক্তাররা তাদের সেবায় নিয়োজিত থেকেও তাদের অনেকের রোগ হয় না। আবার অনেকে না যেয়েও আক্রান্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে সহীহ আক্বীদা হল, রোগের মাঝে সংক্রমণ বা অন্যের মাঝে বিস্তৃত হওয়ার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কেউ অনুরূপ রোগীর সংস্পর্শে গেলে যদি তার আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা হয়, সে ক্ষেত্রেই কেবল সে আল্লাহর হুকুমে আক্রান্ত হবে, অন্যথায় নয়। কিংবা এরূপ আক্বীদা রাখতে হবে, এসব রোগের মাঝে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ তা'আলা সংক্রমণের এই নিয়ম রেখে দিয়েছেন। তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে সংক্রমণ নাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ সংক্রমণের এই ক্ষমতা রোগের

নিজস্ব ক্ষমতা নয়, এর পশ্চাতে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা এবং তার ইচ্ছার দখল থাকে। তবে ইসলাম প্রচলিত এসব সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগীর নিকট, এ কারণে যে, উক্ত রোগীর নিকটে গেলে আর তার আক্রান্ত হওয়ার খোদায়ী ফায়সালা হওয়ার কারণে সে আক্রান্ত হলে তার ধারণা হতে পারে যে, উক্ত রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে, এভাবে তার আক্বীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা যেন হতে না পারে, এজন্যই ইসলাম এরূপ বিধান দিয়েছে। তবে কেউ মজবুত আকীদার অধিকারী হলে, সে অনুরূপ রোগীর নিকট যেতে পারে। এমনিভাবে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোককেও সুস্থ এলাকার লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে। যাতে তা অন্য কারো আক্বীদা নষ্টের কারণ না ঘটে।

রত্ন ও পাথরের প্রভাব বিষয়ে আক্বীদা

মণি, মুক্তা, হিরা, চুনি, পান্না, আকীক প্রভৃতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে-এরূপ আক্বীদা বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ, মুসলমানদের নয়। [সূত্র : আপকে মাসাইল আওড় উনকে হল।]

হস্ত রেখা বিচার বিষয়ে আক্বীদা

পামিষ্ট্রি (Pamistry) বা হস্তরেখা বিচার বিদ্যার মাধ্যমে হাতের রেখা ইত্যাদি দেখে ভাগ্যের বিষয়ও ভূত-ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেয়া হয়, ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা কুফরী। [সূত্র:আপকে মাসাইল আওড় উনকে হল, প্রথম খণ্ড।]

নজর ও বাতাস লাগার বিষয়ে আক্বীদা

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী নজর লাগার বিষয়টি সত্য। জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনজর লেগে গেলে তার ক্ষতি সাধন হতে পারে। আপনজনের

প্রতিও আপনজনের বদনজর লাগতে পারে। এমনকি সন্তানের প্রতিও মা-বাবার বদনজর লাগতে পারে। আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন-ভূতের বাতাস অর্থাৎ তাদের খারাপ নজর বা খারাপ আছর লাগা, তা হলে এটাও সত্য। কেননা, জিন-ভূত মানুষের ওপর আছর করতে সক্ষম।

কেউ কারো কোন ভালো কিছু দেখলে যদি মাশাআল্লাহ বলে তা হলে তার প্রতি বদনজর লাগে না। আর কারো ওপর কারো বদনজর লেগে গেলে যার নজর লাগার সন্দেহ হয় তার মুখ হাত [কনুইসহ] হাঁটু এবং ইসতিনজার জায়গা ধুয়ে সেই পানি যার ওপর নজর লেগেছে তার ওপর ঢেলে দিলে আল্লাহ চাহে তো ভালো হয়ে যাবে। বদনজর থেকে হিফাযতের জন্য কাল সূতা বাঁধা বা কালি কিংবা কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন এবং কুসংস্কার।

কুলক্ষণ ও সূলক্ষণ বিষয়ে আক্বীদা :

ইসলামী আক্বীদা মতে কোন বস্তু বা অবস্থা থেকে কু-লক্ষণ গ্রহণ করা বা কোন সময়, দিন ও মাসকে খারাপ মনে করা বৈধ নয়। এমনিভাবে কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়-এমন কোন লক্ষণ মানাও বৈধ নয়। তবে কেউ কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় রয়েছে, এরূপ মুহূর্তে ঘটনাক্রমে বা কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে খুশি বা সাফল্যসূচক কোন শব্দ শ্রুতিগোচর কিংবা দৃষ্টিগোচর হলে সেটাকে সু-লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এটা মূলতঃ কোন শব্দ বা বস্তুর প্রভাবকে বিশ্বাস করা নয়-এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমতের আশাকে শক্তিশালী করে।

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে আক্বীদা

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়-হতেও পারে নাও হতে পারে। যেমন দু‘আ করা হলে রোগ ব্যাধি আরোগ্য হতেও পারে নাও হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মর্জি হলে আরোগ্য লাভ হবে, তা না হলে নয়। এমনিভাবে তাবীজ ও

www.darsemansoor.com

ঝাড়-ফুঁকও একটি দু‘আ। মনে রাখতে হবে তাবীজের চেয়ে কিন্তু দু‘আ আরো বেশি শক্তিশালী। তাবীজ এবং ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলেও সেটা তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। বরং আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাতেই তা হয়ে থাকে।

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকই ইজতিহাদ এবং কুরআন থেকে উদ্ভূত, কুরআন ও হাদীসে যার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, অমুক তাবীজ বা অমুক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাজ হবে। অতএব, কোনো তাবীজ বা কোন ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাঙ্খিত ফল লাভ না হলে এরূপ বলার বা এমন ভাবার অবকাশ নেই যে, কুরআন ও হাদীস কি তা হলে সত্য নয়?

যেসব বাক্য বা শব্দ কিংবা যেসব-নকশার অর্থ জানা যায় না, তার দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়।

কোন বিষয়ের তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় রয়েছে বা বিশেষ কোন শর্ত ইত্যাদি রয়েছে-এমন মনে করা ঠিক নয়।

তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারো অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক-এমন ধারণা করাও ভুল।

তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা ভালো আছর হলে সেটাকে তাবীজদাতার বা আমিলের বুযুর্গী মনে করা ঠিক নয়। যা কিছু হয় সব আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। [সূত্র: ফাতাওয়া শামী।]

ফাতিহা ইয়াযদাহম

ফাতিহা বলতে বোঝানো হয়, কোন মৃতের জন্য দু'আ করা, ঈসালে সওয়াব করা। ইয়াযদাহম ফার্সি শব্দটির অর্থ একাদশ। ৫৬১ হিজরী মুতাবিক ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ রবিউস সানী তারিখে বড়পীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রবিউস সানীর ১১ তারিখে যে মৃত্যুবার্ষিকী পালন, উরস ও

www.darsemansoor.com

ফাতিহাখানী করা হয় তাকে বলা হয় ফাতিহা ইয়াযদহম।

পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামে জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও উরস করা শরী‘আত সমর্থিত অনুষ্ঠান নয়। তবে তিনি অনেক উঁচু দরের অলী ও বুযুর্গ ছিলেন। তাই এই নির্দিষ্ট তারিখের অনুসরণ না করে অন্য যে কোন দিন তাঁর জন্য দু‘আ করলে এবং জায়িয তরীকায় তাঁর জন্য ঈসালে সওয়াব করলে তাঁর রূহানী ফয়েজ ও বরকত লাভের ওসীলা হবে এবং তা সওয়াবের কাজ হবে।

আখেরী চাহার শোমবাহ

আখেরী চাহার শোমবাহ কথাটি ফার্সি। এর অর্থ শেষ বুধবার। সাধারণ পরিভাষায় আখেরী চাহার শোমবাহ বলে সফর মাসের শেষ বুধবারকে বোঝানো হয়ে থাকে। বলা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অসুস্থতার মধ্যে রবিউল আওয়াল মাসের শুরু ভাগে ইনতিকাল করেন, সে

অসুস্থতা থেকে সফর মাসের শেষ বুধবারে অর্থাৎ আখেরী চাহার শোমবায় কিছুটা সুস্থতা বোধ করেছিলেন, তাই এ দিবসটিকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। অথচ এ তথ্য সহীহ নয় বরং ও বিশুদ্ধ তথ্য হল, এ বুধবারেই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। কাজেই যে দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা বেড়ে যায়, সেদিন ইহুদী প্রমুখদের জন্য খুশির দিন হতে পারে, মুসলমানদের জন্য নয়। অতএব, সফর মাসের শেষ বুধবার অর্থাৎ আখেরী চাহার শোমবাহকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা এবং ঐ দিন ছুটি পালন করা জায়িয হবে না। [সূত্র : ফাতাওয়া রাহীমিয়া, খণ্ড ১]

শরী‘আতের আক্বীদা বিরুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কু-লক্ষণের তালিকা

১. হাতের তালু চুলকালে অর্থকড়ি আসবে মনে করা।

২. চোখ লাফালে বিপদ আসবে মনে করা।

www.darsemansoor.com

৩. কুত্তা কান্নাকাটি করলে রোগ বা মহামারী আসবে মনে করা।

৪. এক চিরুনিতে দু জন চুল আঁচড়ালে এই দু জনের মাঝে ঝগড়া লাগবে মনে করা।

৫. কোন বিশেষ পাখি ডাকলে মেহমান আসবে মনে করা।

৬. যাত্রাপথে পেছন থেকে কেউ ডাকলে যাত্রা খারাপ হবে মনে করা।

৭. যাত্রা পথে হোঁচট খেলে বা মেয়র দেখলে বা কাল কলসি দেখলে কিংবা বিড়াল দেখলে-কু-লক্ষণ মনে করা। অমুক দিন যাত্রা নাস্তি, অমুক দিন ভ্রমণ নাস্তি ইত্যাদি বিশ্বাস করা। মোটকথা কোন দিন বা কোন মুহূর্তকে অশুভ মনে করা।

৮. যাত্রার মুহূর্তে কেউ তার সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না-এমন বিশ্বাস করা।

৯. পেঁচা ডাকলে ঘরবাড়ি বিরান হয়ে যাবে মনে করা।

১০. জিহ্বায় কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে মনে করা।

১১. চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে মনে করা।

১২. দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকি দিলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে মনে করা।

১৩. কোনো লোকের আলোচনা চলছে, এই ফাঁকে বা এর কিছুদিন পরে সে এসে পড়লে এটাকে তার দীর্ঘজীবী হওয়ার লক্ষণ মনে করা।

১৪. কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হলে সেই ঘরের মালিক ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবে মনে করা।

১৫. আসরের পর ঘর ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা।

১৬. ঝাড়ু দ্বারা বিছানা পরিস্কার করলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে মনে করা।

১৭. কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চা মারা যাবে মনে করা।

১৮. ঝাড়ুর আয়াত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে মনে করা।

১৯. কোন প্রাণী বা প্রাণীর ডাককে অশুভ বা অশুভ লক্ষণ মনে করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ ধরণের আরো অনেক ভুল বিশ্বাস আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। সেসব থেকে মাত্র কয়েকটি এখানে বাছাই করে উল্লেখ করা হল। এসব নেয়া হয়েছে "আগলাতুল আওয়াম" গ্রন্থ থেকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বিষয়ে আক্বীদা :

এই হাদীসে বলা হয়েছে, অতি শীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় [দলে] বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত। অর্থাৎ এরা হবে জান্নাতী। আর বাকি সবগুলো ফেরকা হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন: আমি ও আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর আছি তার অনুসারীগণ।[সূত্র : তিরমিযী শরীফ, ২য় খণ্ড।]

এই হাদীসের মধ্যে যে মুক্তিপ্রাপ্ত বা জান্নাতী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদেরকে বলা হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। নামটির মাঝে সুন্নাত শব্দ

দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত ও পথ এবং জামাত শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে সাহাবায়ে কিরামের জামাত উদ্দেশ্য। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের মত ও পথের অনুসারীদেরকে বলা হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন সময়ে যেসব সম্প্রদায় ও ফেরকার উদ্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বযুগে এই দলটিই হল সত্যাশ্রয়ী দল। সর্বযুগে ইসলামের মৌলিক আকাইদ বিষয়ে হকপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম এভাবে কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের মত ও পথের অনুসরণ করে আসছেন। এ দলটি তারই অনুসরণ করে আসছে। সর্বযুগে এই দলই হচ্ছে বড় দল। সর্বযুগেই এরা টিকে আছে। এর বাইরে যারা গিয়েছে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বহির্ভূত বিপথগামী ও বাতিলপন্থী সম্প্রদায়। এ ধরণের অনেক বাতিল সম্প্রদায় কালের অতল তলে বিলীন হয়ে গেছে। যারা

রয়েছে এখনো, তারাও অচিরেই বিলীন হবে। হকপন্থী দল চিরকালই টিকে থাকবে।

ঈমান সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে মনে সন্দেহে জাগলে তখন করণীয় কী?

যেসব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, সেসব বিষয়ে যদি কখনো মনে সন্দেহ হয় এবং ওয়াসওয়াসা দেখা দেয়, যেমন মনে সন্দেহ দেখা দিল যে,[নাউযুবিল্লাহ] আসলে আল্লাহ বলে কেউ আছেন কি! কিংবা সন্দেহ দেখা দিল যে, জান্নাত জাহান্নাম আসলে আছে কি? এভাবে আল্লাহ ও রাসূল কুরআন, পরকাল, তকদীর ইত্যাদি ঈমান সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে মনে সন্দেহে আসলে তখন তিনটা আমল করণীয়। যথাঃ-

১. আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজীম পড়ে নেয়া।

২. আমানতু বিল্লাহ অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম পড়ে নেয়া।

৩. উক্ত চিন্তা থেকে বিরত হয়ে অন্য কোন চিন্তা বা কাজে লিপ্ত হওয়া।

ঈমান শক্তিশালী বা দুর্বল হয় কিভাবে

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দ্বারা ঈমান শক্তিশালী অর্থাৎ ঈমানের মধ্যে নূর পয়দা হয় এবং তা মজবুত হয়।

১. ঈমানের আলোচনা দ্বারা।

২. ঈমানদারদের সাহচর্য দ্বারা।

৩. আমল দ্বারা। [ঈমানের শাখাগুলোর ওপর আমল দ্বারা]

পক্ষান্তরে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং ঈমানের নূর কমে যায় এমনকি কখনো কখনো ঈমান নষ্ট পর্যন্ত হয়ে যায় নিচে বর্ণিত কারণে।

১. কুফর দ্বারা

২. শিরক দ্বারা

৩. বিদ‘আত দ্বারা

৪. কু-সংস্কার ও কু-প্রথা পালন করার দ্বারা।

৫. গুনাহ করার দ্বারা। (ইয়ানাতে আহকামে যিন্দেগী)

<u>অধ্যায় দুই</u>

ঈমানের সাতাত্তর শাখা

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? বস্তুত যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। [সূত্র : সূরা তাওবা, আয়াত ১২৪।]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

যখন তাদের নিকট কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। [সূত্র : সূরা আনফাল, আয়াত-২।]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায়, কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত, তা মর্মার্থ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি অগ্রগতি ঘটে; অর্থাৎ ঈমানের নূর, আস্বাদ ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হযরত আলী রাযি. বলেন : যখন ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি শ্বেত বিন্দুর মতো দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেত বিন্দু ততই সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। [সূত্র : তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৬. মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৪৯৪।]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেন, ঈমানের সত্তরের ওপর শাখা আছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো, (দিলের বিশ্বাসের সাথে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খণ্ড ১, পৃষ্টা ৪৭]

ঈমান ও ইসলাম কতগুলো কার্যের সমষ্টির নাম। সেই কার্যাবলীর মধ্যে কতগুলো দিলের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কতগুলো জবান দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং কতকগুলো শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মোট কার্য ৭৭টি। তন্মধ্যে দিলের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৩০টি, জবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৭টি এবং হাত-পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৪০টি। বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৩০টি কাজ-যা দিলের দ্বারা সমাধা হয়

১. আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনয়ন করা

আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নের অর্থ শুধু আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা নয়, বরং অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব, নিরাকার, তা স্বীকার করা, তাঁর সিফাত অর্থাৎ মহৎ গুণাবলী স্বীকার করা এবং তিনি যে এক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান ও দয়াময় এটাও স্বীকার করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়-এ কথাও বিশ্বাস করা কর্তব্য।

২. সবই আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্ট-এর ওপর ঈমান রাখা

মুসলমানগণের অকাট্য বিশ্বাস ও ঈমান রাখতে হবে যে, ভালো-মন্দ ছোট-বড় সমস্ত বিষয় ও বস্তুনিচয়ের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

৩. ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান

ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ, তাঁরা আল্লাহর প্রিয় ও ফরমাবরদার বান্দা। কোন কাজেই তাঁরা বিন্দুমাত্র নাফরমানী করেন না এবং তাঁদের আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতাও অনেক বেশি। আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর অনেক যিম্মাদারী অর্পণ করেছেন।

৪. আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখা :

পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে এরূপ ঈমান রাখতে হবে, এ মহান কিতাবটি কোন মানুষের রচিত নয়; বরং তা আদ্যোপান্ত আল্লাহ তা'আলার কালাম বা বাণী। পবিত্র কুরআন অক্ষরে অক্ষরে অকাট্য সত্য। এত ছাড়াও পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি সেসব ছোট-বড় কিতাব নাযিল হয়েছিল, সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও অকাট্য ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে লোকেরা ঐ সব বিকৃত ও পরিবর্তন করে ফেলেছে। কিন্তু কুরআন শরীফকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রূপে সংরক্ষণ করার ভার স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। সেই হিসেবে পবিত্র কুরআন অবিকল নাযিলকৃত অবস্থায়ই বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না।

৫. পয়গাম্বরগণ সম্বন্ধে ঈমান রাখা

বিশ্বাস রাখতে হবে, নবী বা পয়গাম্বর বহুসংখ্যক ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ ও বেগুনাহ ছিলেন। তাঁরা স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ আদায় করে গেছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর আনীত শরী'আতই আমাদের পালনীয়।

৬. আখিরাত সম্বন্ধে ঈমান রাখা

আখিরাতের উপর ঈমান রাখার অর্থ হলো, কবরের সওয়াল-জওয়াব ও সওয়াল-আযাব বিশ্বাস করা, হাশরের ময়দানে আদি হতে অন্ত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সকল মানুষ একত্রিত হবে, নেকী-বদী পরিমাপ করা হবে ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ কিয়ামত সম্বন্ধে যত কথা কুরআন ও হাদীস শরীফে এসেছে, সব বিশ্বাস করা জরুরী।

৭. তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান রাখা

তাকদীর সম্বন্ধে কখনো তর্ক-বিতর্ক করবে না, বা মনে সংশয়-সন্দেহ স্থান দিবে না। দুনিয়াতে যা

কিছু হয়েছে, হচ্ছে বা হবে, সবই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন ও হুকুমের তাবেদার। আল্লাহপাকের ক্ষমতায়ই সবকিছু হয়। অবশ্য আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও কাজের ইখতিয়ার দিয়েছেন। মানুষ নিজের ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় ভালো-মন্দ যা কিছু করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন।

৮. বেহেশতের ওপর ঈমান রাখা

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বেহেশতের কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহপাক নেককার মু'মিন বান্দাদেরকে বেহেশতে তাদের আমলের যথার্থ প্রতিদান ও পুরস্কার দিবেন। তারা ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে চিরকাল বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত ও শান্তি ভোগ করবেন। বেহেশতের বাস্তবতা সম্পর্কে দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে।

৯. দোযখের ওপর ঈমান রাখা

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে দোযখের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহপাক কাফির, ফাসিক-ফাজির ও

বদকারদেরকে জাহান্নাম বা দোযখে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত পরিণাম বা শাস্তি দিবেন। কাফিররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আর গুনাহগার ঈমানদাররা জাহান্নামে নির্দিষ্ট মেয়াদের শাস্তি ভোগের পর ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে যাবে। দোযখের বাস্তবতার ওপর ঈমান রাখতে হবে।

১০. অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত রাখা

অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি সর্বদা মুহাব্বত বদ্ধমূল রাখতে হবে। এমনকি দুনিয়ার সবকিছু থেকে আল্লাহপাকের মুহাব্বত বেশি হতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন- وَا
لَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

যারা মু'মিন, আল্লাহর প্রতি তাদের মুহাব্বত সর্বাধিক প্রকট।

১১. আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সাথে দোস্তি ও দুশমনি রাখা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের মধুরতা, প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে-

ক. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক মুহাব্বত করবে।

খ. কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে মুহাব্বত করতে হলে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য করবে না।

গ. কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মন্দ জানতে হলে, শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই মন্দ জানবে। [সূত্র: মুসনাদে আহমাদ। খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৩, ১৭৪, ২৩০, ২৪৮, ২৮৮।]

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুহাব্বত রাখা, সুন্নাতকে ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মুহাব্বত রাখা ঈমানের বিশেষ শাখা। এর অর্থ শুধু মুহাব্বতের দাবি করা বা নাত-গযল পড়া নয়, বরং এর সংশ্লিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হবে। যথা-

১. অন্তরের দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভক্তি করতে হবে।
২. বাহ্যিকভাবে তাঁর আদব-তাযীম রক্ষা করতে হবে।
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দুরূদ ও সালাম পড়তে হবে।
৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত তরীকার পায়রবি করতে হবে।

১৩. ইখলাসের সাথে আমল করা

যে কোন নেক কাজ খালিসভাবে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার নিয়তে করা ঈমানের দাবি। নিয়ত খালিস হবে, মুনাফিকী ও রিয়া থাকতে পারবে না। মু‘মিনের সকল কাজ একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই হতে হবে।

১৪. গুনাহ থেকে তাওবা করা

তাওবা শুধু গঁদ-বাধা কতগুলো শব্দ উচ্চারণের নাম নয়; বরং গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পরহেয করা জরুরী। এক

বুযুর্গ আরবীতে অতি সংক্ষেপে তাওবার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন- التوبة تحرق الحشا على الخطأ গুনাহের কারণে মনের ভিতর অনুতাপের আগুন জ্বলাকেই তাওবা বলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: الندم توبة অনুতাপের নামই তাওবা। [সূত্র:মুসানাদে আহমাদ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা -৩৭৬, ৪২৩, ৪৩৩।]

১৫.অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা

হযরত মু‘আয রাযি. হতে রিওয়ায়েত আছে যে, ঈমানওয়ালার দিল কখনো খোদার ভয় ছাড়া থাকে না, সবসময়ই তা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকে। কোন সময়ই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। [সূত্র: হিলইয়াতুল আউলিয়া।]

১৬. আল্লাহপাকের রহমতের আশা করা

কুরআন শরীফে আছে, যারা কাফির, তারাই শুধু আল্লাহপাকের রহমত হতে নিরাশ হয়। আল্লাহর রহমতের আশা রাখা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

১৭. লজ্জাশীলতা বজায় রাখা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- الحيا ء شعبة الايمان

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বড় শাখা। [সূত্র: বুখারী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬ ও মুসলিম খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭।]

১৮. শুকরগুযার হওয়া

শুকর দুই প্রকার। ক. আল্লাহর শুকর আদায় করা, যিনি প্রকৃত দাতা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার শুকর করো, নাশুকরি করো না।

খ. মানুষের শুকর আদায় করা। অর্থাৎ যাদের হাতের মাধ্যম আল্লাহপাকের নেয়ামত পাওয়া যায়, তাদের শুকর করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকর আদায় করলো না, সে আল্লাহর শুকর করলো না।

১৯. অঙ্গীকার রক্ষা করা

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

হে ঈমানদারগণ! অঙ্গীকার পূর্ণ করো। অর্থাৎ কাউকে কোন কথা দিয়ে থাকলে তা রক্ষা করো। [সূত্র: সূরা মায়িদা ১]

২০. সবর বা ধৈর্য ধারণ করা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যারা সবর করে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের সাথে (সহায়) আছেন।

২১. তাওয়াযু বা নম্রতা অবলম্বন করা

নম্রতা অর্থ নিজেকে নিজে অন্তর থেকে সকলের তুলনায় ছোট মনে করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা‘আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। [সূত্র: হিলয়াতুল আউলিয়া খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১২৯, মিশকাত-৪৩৪।]

২২. দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল হওয়া

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রিওয়ায়েত করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুর্ভাগা, তার থেকেই দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়। [সূত্র: মুসনাদে আহমাদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৩০১ ও তিরমিযী শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪।]

২৩. তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা

তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকাকে 'রিয়া বিল কাযা' বলে, মহান আল্লাহর সকল ফয়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা। আল্লাহর হুকুমে বিপদ-আপদ বা দুঃখ-কষ্ট আসলে অসন্তুষ্ট না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মনে কষ্ট লাগতে দিবে না, পেরেশানও হবে না। কেননা,কষ্টের বিষয়ে কষ্ট লাগাই তো স্বাভাবিক| তবে আসল কথা হচ্ছে, কষ্ট লাগলেও বুদ্ধির দ্বারা ও জ্ঞানের দ্বারা তার মধ্যে কল্যাণ আছে এবং এটা আল্লাহপাকেরই হুকুমে হয়েছে মনে করে সেটাকে পছন্দ করবে। কষ্টকে মনে স্থান দিবে না।

২৪. তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন- و على الله فليتوكل المؤمنون

যাদের ঈমান আছে, তাদের শুধু আল্লাহ তা‘আলারই ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা উচিত।

২৫. অহংকার না করা

অহংকার না করা অর্থাৎ অন্যের তুলনায় নিজেকে নিজে ভালো এবং বড় মনে না করা ঈমানের অঙ্গ। তাবারানী নামক হাদীসের কিতাবে একটি হাদীস বর্ণিত আছে- তিনটি জিনিস মানুষের জন্যে সর্বনাশকারী-

ক. লোভ-যে লোভকে না সামলিয়ে বরং মানুষ তার অনুগত হয়।

খ. নফসানী খায়েশ-যে নফসানী খায়েশকে দমন না করে বরং তার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা হয়।

গ. অহংকার-তাকাব্বুর বা অন্যের তুলনায় নিজেকে ভালো ও বড় মন করে। [সূত্র : তাবারানী আউসাত: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা-৪৮৬, হিলয়া: খণ্ড ৩,-পৃষ্ঠা-২১৯।]

২৬. চোগলখুরী, কীনা ও মনোমালিন্য বর্জন করা

www.darsemansoor.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, চোগলখুরী ও কীনা মানুষকে দোযখে নিয়ে ফেলে। অতএব, কোন মু‘মিনের দিলেই এ গর্হিত খাসলত থাকা উচিত নয়। [সূত্র: তারারানী, আউসাত খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১২৫ হাদীস (৪৬৫৩)]

২৭. হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্ম করে ফেলে, তদ্রূপ হিংসা মানুষের নেকীকে ভস্ম করে ফেলে। অতএব খবরদার! খবরদার! তোমরা কখনো হিংসা-বিদ্বেষ করবে না। [সূত্র: ইবনে মাজাহ পৃষ্ঠা -৩১০]

২৮. ক্রোধ দমন করা

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন শরীফে ক্রোধ দমনকারীদের প্রশংসা করেছেন। অনর্থক রাগ করা গুনাহ। রাগ-ক্রোধ দমনে হাদীসে তাকীদ এসেছে। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আয়াত আসলে, সেখানে ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রদর্শনই ঈমানের দাবি।

২৯. অন্যের অনিষ্ট সাধন ও প্রতারণা না করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে অন্যের ক্ষতি করে অর্থাৎ পরের মন্দ চায়, অপরকে ঠকায়, ধোঁকা দেয়, তার সাথে কোন সংশ্রবই নেই। [সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭০]

৩০. দুনিয়ার অত্যধিক মায়া-মুহাব্বত ত্যাগ করা

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে দুনিয়াকে ভালবাসবে, তার আখিরাতের লোকসান হবে এবং যে আখিরাতকে ভালবাসবে, তার দুনিয়ার কিছু ক্ষতি হবে। হে আমার উম্মতগণ! তোমাদের মঙ্গলের জন্যে আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ভালোবেসে চিরস্থায়ী আখিরাতকে নষ্ট করে দিও না। তোমরা সকলেই চিরস্থায়ী পরকালকেই শক্তভাবে ধর এবং বেশি করে ভালবাসো। অর্থাৎ দুনিয়ার মুহাব্বত পরিত্যাগ করে আখিরাতের প্রস্তুতিতে আমলের প্রতি যথাযথ ধাবিত হও। [সূত্র: মুসনাদে আহমদ খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা -৪১২ ও বাইহাকী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭০।]

ঈমান সংশ্লিষ্ট সাতটি কাজ-যা জবানের দ্বারা সমাধা হয়

৩১. কালিমা পড়া

কালিমার অর্থ-আল্লাহ তা‘আলার সঙ্গে বান্দার অঙ্গীকারের কথা দিলে বিশ্বাস করার সাথে সাথে মুখে স্বীকার করা। ইমাম আহমদ রহ. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা ঈমান তাজা করতে থাকবে। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান তাজা করতে হবে কেমন করে? হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, খুব বেশি করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমা পড়তে থাকবে। [সূত্র: আহমদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৩৫৯।]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে রিওয়ায়েত আছে হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত (মুমূর্ষ) লোকদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমার তালকীন দাও। [সূত্র:মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৩০০]

এতদ্ব্যতীত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমার ফযীলত সম্বন্ধে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। অন্তরে আল্লাহ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমানের পাশাপাশি মুখে তার প্রকাশই রয়েছে কালিমার ভিতর।

৩২. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাক। কেননা, যারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকবে, কিয়ামতের দিন স্বয়ং কুরআন শরীফ তাদের জন্য শাফা‘আত করবে। [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭০।]

৩৩. দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা যার ভালো করার ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের ইলম ও কুরআনী জ্ঞান দান করেন। [সূত্র:বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬ ও মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৩] তিনি আরো বলেছেন,

ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। [সূত্র : ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২০]

আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকার কারণে এবং উসতাদের কাছে হাদীস না পড়ার দরুন অনেকে এই হাদীসের দ্বারা আধুনিক বিদ্যার নামে ভাষা শিক্ষা এবং জ্ঞানের নামে জড়জগতের জ্ঞান লাভের অর্থ বুঝে এবং বুঝিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা। এখানে ইলম দ্বারা একমাত্র দ্বীনের জ্ঞানই উদ্দেশ্য।

৩৪. দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কারো নিকট কোন ইলমের কথা জিজ্ঞেস করা হলে অর্থাৎ শিক্ষাপ্রার্থী হলে, সে জানা সত্ত্বেও যদি তা প্রকাশ না করে অর্থাৎ শিক্ষা না দেয়, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে (শাস্তি) দিবেন। [সূত্র: আবু দাউদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১৫ ও তিরমিযী শরীফ, খণ্ড -২, পৃষ্ঠা-৯৩]

অন্য হাদীসে এসেছে, দ্বীন শিক্ষা দানকারীর জন্য আসমান ও জমিনের সকল মাখলুক দু'আ করতে থাকে। [সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৯৭ ও মিশকাত শরীফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪।]

তাই আল্লাহপাক যাকে দ্বীনি ইলম দান করে সৌভাগ্যমন্ডিত করেছেন, তার কর্তব্য হচ্ছে, অন্যকে সেই ইলম শিখানো।

৩৫. আল্লাহর নিকট দু'আ বা প্রার্থনা করা

হযরত আনাস রাযি. রিওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দু'আ ইবাদতের মগজ। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৫।]

রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহর নিকট দু'আ চাওয়ার মতো মূল্যবান জিনিস আর নেই। অর্থাৎ বান্দা যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা বড়ই সন্তুষ্ট হন। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -১৭৫।]

তাই আল্লাহপাকের কাছে দু‘আ করতে হবে। হাজত চাইতে হবে।

৩৬. আল্লাহর যিকির করা

হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. রিওয়ায়েত করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে আল্লাহর যিকির করে, সে জীবিতের ন্যায় এবং যে, যিকির করে না, সে মৃত্যু-তুল্য। [সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৪৮ ও মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৫।]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বিভিন্ন জিনিসের ময়লা দূর করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ও যন্ত্র আছে; দিলের মলিনতা দূর করার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে আল্লাহর যিকির। [সূত্র: বাইহাকীম শু‘আবুল ঈমান খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯৬।]

৩৭. বেহুদা কথা হতে জবানকে রক্ষা করা

হযরত সাহল বিন সা’দ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার জন্য যে ব্যক্তি দু’টি জিনিসের যিম্মাদার বা

জামিন হবে-এক যা তার ওষ্ঠদ্বয়ের মাঝে আছে অর্থাৎ জিহ্বা, দুই যা তার উরুদ্বয়ের মাঝে আছে অর্থাৎ লজ্জাস্থান, আমি তার জন্যে বেহেশতের যামিন ও যিম্মাদার হবো। [সূত্র: বুখারী শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৯৫৮-৯৫৯।]

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৪০ টি কাজ যা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সমাধা হয়

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ঈমানের মোট ৪০টি কার্য সমাধা হয়। তন্মধ্যে ১৬টি কাজ নিজেই করতে হয়। ৬টি নিজের লোকদের সঙ্গে করতে হয়। এবং ১৮টি অন্যান্য জনসাধারণের সাথে করতে হয়। বিস্তারিত নিম্নরূপ:

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৬ টি কাজ যা- নিজে নিজেই করতে হয়

৩৮. পাক-সাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তাহারাত (পাক-সাফ থাকা)

ঈমানের অর্ধেক। [সূত্র: মুসলিম, শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৮।]

৩৯. নামায কায়িম করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের ছেলেমেয়েদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার জন্যে আদেশ করো। দশ বছর হলে যদি তারা নামায না পড়ে, তাহলে তাদেরকে হাতের দ্বারা শাস্তি দিয়ে নামায পড়াও। আর তাদের শয়নের বিছানা পৃথক করে দাও, অর্থাৎ যখন তাদের কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি হয়, তখন তাদের পৃথক বিছানায় শুতে দাও। [সূত্র: আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭০।]

নামায পড়ায় প্রভূত ফযীলত ও সওয়াব এবং নামায তরক করায় কঠিন শাস্তি ও আযাব সম্বন্ধে কুরআনের বহু আয়াত এবং প্রচুর হাদীসের বর্ণনা এসেছে।

৪০। যাকাত দেয়া

www.darsemansoor.com

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা‘আলা যাদেরকে মাল দান করেছেন, তারা যদি যাকাত না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন সেই মালের দ্বারা বিষাক্ত সাপ বানানো হবে এবং সে সাপ তাদের গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৮।]

৪১। রোযা রাখা

রোযার ফযীলত সম্বন্ধে এবং রোযা ছাড়লে যে কত বড় গুনাহ হয়, সে বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এক হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ, ইচ্ছা পূর্বক রমযানের কোন একটি রোযা ছেড়ে দিলে সারা জীবন রোযা রেখেও তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৯।]

৪২. হজ্ব করা (উমরা পৃথক আমল হলেও তা হজেরই একটি পর্যায়)

হযরত আবু উমামা রাযি. হতে রিওয়ায়েত আছে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, গরিব হওয়া, বাদশাহর জুলুমগ্রস্ত হওয়া কিংবা রোগাক্রান্ত হওয়া (এই তিন কারণে হজ্ব না করতে পারলে, তাতে গুনাহ হবে না); এই তিন প্রকার বাধা-বিঘ্নের কোন একটি না থাকা স্বত্বেও যে ব্যক্তি হজ্ব না করবে, তার ইচ্ছা, চাই সে ইহুদী হয়ে মারা যাক অথবা নাসারা হয়ে মারা যাক। অর্থাৎ মুসলমান হিসেবে তার মৃত্যু শংকামুক্ত নয়। [সূত্র: সুনানে দারিমী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৪৫।]

অবশ্য রোগাক্রান্ত ধনী ব্যক্তির হজ্ব মাফ হবে না। রোগমুক্তির সম্ভাবনা না থাকলে তার ওপর হজ্ব বদল করানো জরুরী।

৪৩. ইতিফাক করা

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তা‘আলা যাবৎ না ওফাত দিয়েছেন, সে যাবৎ তিনি সর্বদা রমযান শরীফের

শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর সম্মানিতা বিবিগণ ই'তিকাফ করেছেন। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭১ ও মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা -৩৭১।]

৪৪. হিজরত করা

ঈমান বাঁচানোর জন্য স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণকে 'হিজরত' বলে। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হিজরতের কারণে পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। [সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৬]

৪৫. নযর (মান্নত) পুরা করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমাবরদারি করার নযর (মান্নত) মানবে, তার সে নযর-মান্নত পুরা করতে হবে; কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানী করার মান্নত মানে, তাহলে সেই মান্নত পুরা করা যাবে না। এ ধরণের মান্নত

করা গুনাহ। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৯১]

৪৬. কসম রক্ষা করা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ কসম খেলে তা রক্ষা করো। অর্থাৎ কসম খেলে তা ঠিক রাখা অথবা কসম ভঙ্গ হলে, তার কাফফারা দেয়া কর্তব্য। [সূত্র :সূরা মায়িদা, আয়ত-৮৯।]

৪৭. কাফফারা আদায় করা

কাফফারা চার প্রকার। যথা-ক, কসমের কাফফারা, খ. ভুলবশত খুনের কাফফারা, গ. স্ত্রীর সাথে যিহার করার কাফফারা ও ঘ. রমযানের রোযার কাফফারা। এ সকল ব্যাপারে কাফফারা ওয়াজিব হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কাফফারা আদায় করা ঈমানের দাবি।

৪৮. সতর ঢাকা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহপাকের ওপর এবং

কিয়ামত দিনের ওপর যে ঈমান রাখে, সে যেন কাপড় পরে হাম্মামে (গোসলখানায়) যায়, অর্থাৎ মানুষদের সম্মুখ দিয়ে সতর খুলে না যায়। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৭।]

৪৯. কুরবানী করা

হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম রাযি. হতে রিওয়ায়েত আছে, একদা সাহাবায়ে কিরাম রাযি. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহু! এই কুরবানী কী জিনিস? হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আ.- এর তরীকা । সাহাবীগণ আরয করলেন, হুযূর! আমরা এর প্রতিদানে কী পাব? হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী পাবে। [সূত্র: ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২২৬।]

কুরবানীর ফযীলত সম্বন্ধে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

৫০. মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা

হযরত জাবির রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা তোমাদের কোন মুসলমান ভাইকে কাফন দাও, তখন ভালোভাবে কাফন দিবে। [সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৬]

৫১. ঋণ শোধ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে পারলে, সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু পরের ঋণ অর্থাৎ বান্দার যে কোন প্রকার হক মাফ হয় না। [সূত্র : মুসলিম শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩৫।] সুতরাং, খুব বেশি জরুরী দরকার ও একান্ত অপারগতা ব্যতীত ঋণ গ্রহণ করাই অনুচিত। তারপরেও ঠেকায় পড়ে ঋণ করলে ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথেই তা পরিশোধ করে দেয়া ঈমানের দাবি। যাতে করে করজদাতাকে কষ্টে না ফেলা হয়।

মুসলমান ভাইগণ! পরের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকা বড় মারাত্মক কথা। চিন্তা করে দেখুন, শহীদের মর্তবা হতে বড় মর্তবা আর কার হতে পারে? অথচ সকল প্রকার গুনাহ মাফ হলেও বান্দার হক মাফ হবে না।

৫২. ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা বজায় রাখা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সত্যবাদী খাঁটি বিশ্বস্ত কারবারী-ব্যবসায়ী হাশরের ময়দানে নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গী হবে। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা -২৩০।]

৫৩. সত্য সাক্ষ্য দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন- وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

সাক্ষ্য গোপন করো না। অর্থাৎ সত্য ঘটনা জেনে তা লুকিয়ে রেখো না। যে তা লুকিয়ে রাখবে, তার আত্মা পাপিষ্ঠ। [সূত্র : সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৩।]

সত্য ঘটনা জেনেও প্রয়োজনের সময় সাক্ষ্য না দিয়ে গোপন করা দুরুস্ত নয়।

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৬টি কাজ- যা আপনজনের সাথে সম্পৃক্ত

৫৪. বিবাহের দ্বারা চরিত্র রক্ষা করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করতে পারে, তার বিবাহ করা উচিত। কেননা, বিবাহ করলে চক্ষুর হেফাযত হয় এবং কামরিপুও দমন হয়। [সূত্র:বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৫৮ ও মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১,পৃষ্ঠা৪৪৯।]

৫৫. পরিবারবর্গের হক আদায়

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিজের পরিবার পরিজনের জরুরত পূর্ণ করার জন্যে খরচ করাই মালের সর্বোৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহার। [সূত্র : মুসলিম শরীফ।]

নিজের পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও চাকর-নওকর, গোলাম-বাদী ইত্যাদিও পরিবারভুক্ত। পরিবার-পরিজনের হক শুধু তাদের খাওয়ানো পরানো আর স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলার নাম নয়, বরং তাদের কুরআন হাদীস ও দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষাদান করা, চরিত্রবান করতে চেষ্টা করা, কুকর্ম, কুসংসর্গ, কুশিক্ষা হতে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের সাথে নরম ব্যবহার করাও তাদের হক (প্রাপ্য)। এ হক আদায় করা ঈমানের শাখা।

৫৬. পিতা-মাতার খেদমত করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পিতা-মাতার খুশিতে আল্লাহর খুশি এবং পিতা-মাতার অসন্তুটিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯।]

অন্য হাদীসে আছে, সন্তান পিতা-মাতার চেহারার দিকে মুহাব্বতের নজরে একবার তাকালে তার

www.darsemansoor.com

আমলনামায় একটি কবুল হজ্বের সওয়াব লেখা হয়।

৫৭. সন্তান লালন-পালন করা

সন্তানদেরকে দ্বীনি ইলম ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়াও লালন-পালনভুক্ত একটি দায়িত্ব। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে হবে, আর সে তাদেরকে যত্নের সাথে ইসলামী আদব-আখলাক দিবে এবং তাদেরকে স্নেহের সাথে লালন-পালন করবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশতে প্রবেশ করবে। [সূত্র: আল-আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী, পৃষ্ঠা-৩৭।]

৫৮. আত্মীয়তা রক্ষা করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আত্মীয়বর্গের সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, সে বেহেশতে যেতে পারবে না। [সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৮৮৫ ও মুসলিম, খণ্ড,-২, পৃষ্ঠা-৩১৫।]

আত্মীয় বলতে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, ভাতিজা-ভাতিজী, ভাগিনা-ভাগিনী, মামা-খালা, নানা-নানী, দাদা-দাদী ইত্যাদি সবাই অন্তর্ভুক্ত।

৫৯. মনিবের ফরমাবরদার হওয়া

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, গোলাম যদি মনিবের অনুগত থেকে আল্লাহর ইবাদত করে তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। [সূত্র : বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৬।]

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৮টি কাজ-যা অন্য লোকদের সাথে সম্পৃক্ত

৬০. ন্যায়বিচার করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিনে আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, তন্মধ্যে ন্যায়বিচারক একজন। [সূত্র : বুখারী, খণ্ড-পৃষ্ঠা-৯০]

৬১. জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা ও জিহাদ করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে যে পাঁচটি কাজের হুকুম করেছেন, তোমাদের আমি সে পাঁচটি কাজের হুকুম করছি। ক. ইমামের [ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধানের] আদেশ শ্রবণ করা, খ. সে আদেশ খুশির সাথে পালন করা, গ. দ্বীন প্রচার করা এবং দ্বীন প্রচারার্থে জিহাদ করা, ঘ. দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে হিজরত করা বা স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করা ও ঙ. খাঁটি মুসলমানদের জামাতের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে থাকা অর্থাৎ তাদের আক্বীদা থেকে সামান্যতম ভিন্ন আক্বীদা পোষণ না করা। যে জামাআত ছেড়ে অর্ধ হাত পরিমাণও দুরে সরে পড়েছে, অর্থাৎ নতুন কোন আক্বীদা গ্রহণ করেছে সে ইসলামের রজ্জুকে গর্দান হতে ফেলে দিয়েছে। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -১১৩-১১৪, ও মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড -৫ পৃষ্ঠা-৩৩৪।]

জামাতের সাথে থাকার অর্থ এই যে, আক্বায়িদ-আমলের বিষয়ে আহলে হকের পায়রবি করবে। যে সকল হক্কানী আলিম-উলামা ও দ্বীনদার মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহ মতে চলেন, তারাই আহলে হক।

৬২. রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের অসিয়ত করছি, আল্লাহ তা‘আলার ভয় সবসময় দিলে জাগরূক রেখো এবং ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান ও খলীফা একজন হাবশী গোলাম হলেও তার আদেশ শ্রবণ করে তা পালন করো। [সূত্র: তিরমিযী শরীফ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা -৩০০।]

ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করা জরুরী। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলামী নীতি বিরোধী কোন ফরমান জারি করেন, তবে তা মানা জায়িয নয়।

৬৩. দু’পক্ষের কলহ মিটিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, কোন দুই দল মুসলমান যদি ঝগড়া-লড়াই করে, তবে তাদের

মধ্যে মীমাংসা করে দাও। এ ক্ষেত্রে যদি এক দল অন্য দলের ওপর অত্যাচার করে, তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যে যাবৎ না তারা আল্লাহর দিকে রুজু হয়। [সূত্র :সূরা হুজুরাত, আয়াত ৯।]

৬৪. সৎকাজে পরস্পরে সহায়তা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সৎকাজ ও পরহেযগারীর বিষয়ে একে অন্যের সহায়তা করা। [সূত্র : সূরা মায়িদা, আয়াত-২।]

আক্ষেপের বিষয়, আজকাল যদি কেউ পরহেযগারী অবলম্বন করে ধর্ম পালন করা শুরু করে তাহলে তার সহায়তা তো দূরের কথা, তাকে উল্টো আরো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। আর যদি কেউ কোন ভালো কিছু শুরু করে, তবে তৎসংশ্লিষ্ট সব বোঝা তারই মাথার ওপর ফেলে রাখা হয় এবং সেই সৎকাজকে তার ব্যক্তিগত ভেবে অন্যেরা তার কোন সহযোগিতা করতে চায় না। এটা উচিৎ নয়।

৬৫. ‘আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার’ করা

আমার বিল মারুফ অর্থ- (নিজে সৎকাজ করার পাশাপাশি) অপরকে সৎকাজের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং নাহী আনিল মুনকার অর্থ (নিজে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি) অন্যকে অসৎকাজে নিষেধ করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক হওয়া আবশ্যক, যারা মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকবে। তারা অপরকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। (যারা এরূপ হবে) তাদেরই (ইহলৌকিক ও পরলৌকিক) জীবন সার্থক ও সফলকাম। [সূত্র: সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৪]

৬৬. হদ বা ইসলামী দণ্ডবিধি কায়িম করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- একটি হদ কায়িম করা চল্লিশ দিনের বৃষ্টি অপেক্ষা অধিক ভাল। অর্থাৎ সুসময়ে চল্লিশ বার বৃষ্টি হলে, দেশে যত পরিমাণ বরকত আসে, একটি হদ কায়িম করলে তদাপেক্ষা অধিক বরকত আসে। [সূত্র: ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-১৮২।]

৬৭. জিহাদ করা বা দ্বীন জারি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-তোমাদের ওপর জিহাদ ফরজ করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। [সূত্র : আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৩ ও মিশকাত শরীফ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১৮।]

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, আখেরী উম্মতের জন্য শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং আল্লাহর জমিনে দ্বীন কায়িমের জন্য সর্বাত্মক

www.darsemansoor.com

প্রচেষ্টা চালানো এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করে জান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা জরুরী।

৬৮. আমানতদারী ও দিয়ানতদারী রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। [সূত্র: বাইহাকী শরীফ শুআবুল ঈমান খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-৭৮ ও মিশকাত শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১৫।]

৬৯. মানুষকে করজে হাসানা দেয়

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দান করলে, দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায়; আর করজে হাসানা দিলে আঠার গুণ সওয়াব অর্জিত হয়। [সূত্র:ইবনে মাজাহ।পৃষ্ঠা-১৭৫।]

৭০. পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান বজায় রাখতে চায়, সে যেন

পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদেরকে কষ্ট না দেয়। [সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৮৮৯, মুসলিম শরীফ খণ্ড-১ পৃষ্ঠা -৫০।]

৭১. কারবারের মধ্যে সততা ও সদাচার অবলম্বন করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন ভীষণ প্রকৃতির ফাসিকরূপে উঠানো হবে। কিন্তু যারা আল্লাহর ভয় দিলে রেখেছে, সদাচারের সাথে বিশুদ্ধ কারবার করেছে এবং সত্য-কথা বলেছে, তারা নাজাত পাবে। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৩০]

৭২. অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহার করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অনর্থক অপচয় করো না। [সূত্র: সূরা আরাফ, আয়াত-৩১।]

বুখারী শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন না। অতিরিক্ত কথা বলা, অর্থের অপব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন ও

তর্ক-বাহাস করা। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-পৃষ্ঠা-২০০।]

৭৩. সালামের জবাব দেয়া

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি হক আছে-ক. সালাম দিলে, জবাব দেয়া। খ. রুগ্ন হলে, সেবা-শুশ্রূষা করা। গ. মৃত্যুবরণ করলে, কাফন-দাফন করা। ঘ. ডাক দিলে বা দাওয়াত দিলে, সে ডাকে সাড়া দেয়া। ঙ. হাঁচি দিলে, জবাব দেয়া। [সূত্র : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৬ মুসলিম খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৩।]

৭৪. হাঁচিদাতার জবাব দেয়া

হাঁচিদাতার জবাব হচ্ছে, হাঁচিদাতা হাঁচি দিয়ে যখন ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলে আল্লাহর শুকর আদায় করবে, তখন শ্রবণকারী ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলে তাকে দু‘আ দিবে। হাঁচিদাতার জবাবে এ দু‘আ দানের তাৎপর্য হচ্ছে, মুসলমান ভাইয়ের খুশিতে খুশি হওয়া এবং তার দুঃখে দুঃখিত হওয়া। অর্থাৎ

এ দু‘আর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে যে, তার সামান্যতম খুশিতেও আমরা খুশি।

৭৫. কাউকেও কোনরূপ কষ্ট না দেয়া

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমান সেই ব্যক্তি, যে হাতের দ্বারা, মুখের দ্বারা, বা অন্য কোন ব্যবহারের দ্বারা কাউকেও কোনরূপ কষ্ট দেয় না। অর্থাৎ সে কারো কোন ক্ষতি করে না। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬।]

৭৬। অবৈধ খেলাধুলা ও রঙ-তামাশা হতে বেঁচে থাকা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন প্রকার খেলা ব্যতীত যত খেলাধুলা আছে, সবই অনর্থক অর্থাৎ পাপের কাজ। সে তিন প্রকার হচ্ছে, জিহাদের জন্যে তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করা, জিহাদের জন্য ঘোড়া দৌড়ানো শিক্ষা করা এবং স্ত্রীর মন রক্ষার্থে তার সাথে কিছু

হাসি-রসিকতা করা। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ। খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৩।]

আল্লাহ তা'আলার হুকুম পূর্ণ করার জন্য শক্তি ও সুস্বাস্থ্য¨ জরুরী। সেই নিয়তে কিছু ব্যায়াম, শরীর চর্চা বা জায়িয খেলাধুলা অনর্থক কাজের মধ্যে শামিল নয়।

৭৭। রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাকে হাদীস শরীফে ঈমানের সবচেয়ে ছোট শাখা হিসেবে বলা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- ঈমানের সত্তরের উপরে শাখা আছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। [সূত্র : মুসলিম শরীফে, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭।]

প্রিয় পাঠক! এখন আমরা প্রত্যেক নীরবে একটু চিন্তা করে দেখি, উল্লেখিত ঈমানের শাখাসমূহের কতগুলো আমাদের হাসিল হয়েছে, আর কতগুলো হাসিল হয়নি। যেগুলো আমাদের হাসিল হয়েছে

তার ওপর আল্লাহ তা‘আলার শুকর আদায় করি। আর যা এখনো হাসিল হয়নি, তা হাসিল করার জন্য হক্কানী আলিমগণের পরামর্শ অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই এবং পূর্ণাঙ্গ ঈমান হাসিল করে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনে তৎপর হই।

ঈমানের শাখা সম্বন্ধে এখানে অতি সংক্ষেপে যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে। দলিল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানার জন্যে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর অমর গ্রন্থ ‘ফুরূউল ঈমান’ পাঠ করুন। এছাড়াও হযরত থানভী রহ.-এর ‘হায়াতুল মুসলিমীন, হুকুকুল ইসলাম, বেহেশতী যেওর, সাফাইয়ে মু‘আমালাত’ এবং তাঁর পছন্দনীয় ইমাম গাযালী রহ. এর-‘তা‘লীমুদ্দীন’ প্রভৃতি কিতাব সহীহ ইসলামী যিন্দেগী গঠন ও পরিপূর্ণ ঈমান ও আমল অর্জনের জন্য বড়ই উপকারী।

এ পর্যন্ত সহীহ ঈমান-আকীদার বিবরণ পেশ করা হলো। এ সকল ঈমান-আকীদার মধ্যে মানুষেরা যে পরিবর্তন করে ভ্রান্ত আকীদার জন্ম দিয়েছে, তা

এখন বর্ণনা করা হচ্ছে। যাতে যেসব ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

সমাপ্ত